সপ্তবর্ণা

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সপ্তবর্ণা

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ সংকলন ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক

অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর

অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর

ড. সরকার আবদুল মান্নান

ড. শোয়াইব জিবরান

শামীম জাহান আহসান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৬

পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০২০

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক **সপ্তবর্ণা**। শিক্ষাক্রমের অনুসরণে শিখনফল অর্জনে সহায়ক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ–এ সকল বিষয় বইয়ে সংকলন করা হয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে কৌতুহলী হয়ে উঠবে এবং তাদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে, সে বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।বিষয়বস্তুর এই বৈচিত্র্য শিক্ষার্থীদের কেবল সাহিত্যের রস উপভোগের সুযোগ তৈরি করে দেবে না; তাদের মানবিক উৎকর্ষ সাধনেও ভূমিকা পালন করবে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে এবং লেখক সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম সার্থক হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
গদ্য			
১.	কাবুলিওয়ালা	– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
২.	লখার একুশে	– আবুবকর সিদ্দিক	৯
৩.	মরু-ভাস্কর	– হবীবুল্লাহ্ বাহার	১৪
৪.	শব্দ থেকে কবিতা	– হুমায়ুন আজাদ	১৯
৫.	হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.)	– সংকলিত	২৪
৬.	পিতৃপুরুষের গল্প	– হারুন হাবীব	৩২
৭.	ছবির রং	– হাশেম খান	৩৯
৮.	সেই ছেলেটি	– মামুনুর রশীদ	৪৪
৯.	বহু জাতিসত্তার দেশ– বাংলাদেশ	– এ. কে. শেরাম	৫০
কবিতা			
১.	নতুন দেশ	– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭
২.	কুলি-মজুর	– কাজী নজরুল ইসলাম	৬২
৩.	আমার বাড়ি	– জসীমউদ্‌দীন	৬৬
৪.	শ্রাবণে	– সুকুমার রায়	৭১
৫.	গরবিনী মা-জননী	– সিকান্‌দার আবু জাফর	৭৫
৬.	সাম্য	– সুফিয়া কামাল	৮০
৭.	কোরানের বাণী	– সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৮৩
৮.	এই অক্ষরে	– মহাদেব সাহা	৮৭
৯.	সিঁথি	– হাসান রোবায়েত	৯২

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না ?"

সে আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটাদুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা পথ দিয়া যাইতেছিল — তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

মিনির চিৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম — সে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস, খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতোমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে — যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী?"

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

উহাদের মধ্যে আরও-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না?"

কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ — সে উল্‌টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফশিট সংশোধন করিতেছি। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

২০২৬

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে — তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী?

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত — মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"

সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতে সানাই বাজিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি?"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"
আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

২০২৩

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস, বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে —আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি

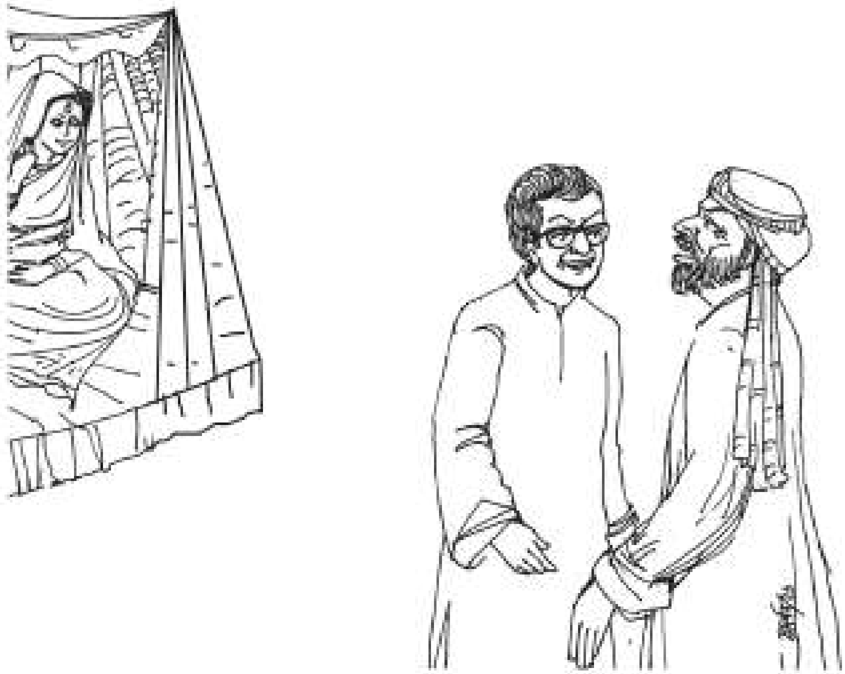

দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস ?"

কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতোমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।”

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শব্দার্থ ও টীকা

দরোয়ান	—	দারোয়ান শব্দের উচ্চারণভেদ।
কাবুল	—	আফগানিস্তানের রাজধানী।
কাবুলিওয়ালা	—	কাবুলের অধিবাসী। অতীতে কাবুলের অনেক লোক নানা কাজে এ দেশে নিয়মিত যাতায়াত করত।
দণ্ড	—	মুহূর্ত।
নভেল	—	উপন্যাস।
সপ্তদশ	—	সতেরো।
পরিচ্ছেদ	—	অধ্যায়।
পার্শ্বে	—	পাশে।
কন্যারত্ন	—	কন্যাকে আদর করে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
ভাবোদয়	—	ভাবের উদয়। মনে চিন্তা বা ভাবনা জাগা।
ঊর্ধ্বশ্বাসে	—	অতি দ্রুতবেগে।
অন্তঃপুর	—	বাড়ির ভিতরের অংশ।
অভিপ্রায়	—	ইচ্ছা।
খোবানি	—	বাদাম জাতীয় ফল।
দুহিতা	—	কন্যা।
দ্বার	—	দরজা।
সমীপস্থ	—	নিকটে, কাছে।
অনর্গল	—	অবিরাম, অনবরত।
সহাস্যমুখ	—	হাসিমুখ।
পঞ্চবর্ষীয়	—	পাঁচ বছর বয়সী।
প্রুফশিট	—	কোনো লেখা ছাপার আগে বানান, বাক্য, যতিচিহ্ন এসব সংশোধনের জন্য মুদ্রিত পত্র।
মেওয়া	—	ডালিম, আঙ্গুর, বাদাম প্রভৃতি ফল।

খোঁখী	—	কাবুলিওয়ালা কর্তৃক 'খুকি' শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ।
স্বভাববিরুদ্ধ	—	স্বভাবের বিপরীত।
মুষ্টি আস্ফালন	—	জোরে মুঠি নাড়িয়ে রাগ প্রকাশের ভঙ্গি।
নিঃসংশয়	—	শঙ্কাহীন।
কিঞ্চিৎ	—	অল্প।
ধারিত	—	ঋণগ্রস্ত।
প্রফুল্ল	—	আনন্দিত।
লড়কি	—	মেয়ে।

পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষার সাধুরীতির সাহিত্য পাঠে অনুপ্রাণিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ভালোবাসার অনুভূতি অনেকাংশেই এক। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের মরু পর্বতের রুক্ষ প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা একজন পিতা এবং একজন বাঙালি পিতার ভিতরের স্নেহপ্রবণ মনের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দেশকালের সীমারেখা পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। যে দেশের, যে সময়ের বা যে সংস্কৃতিরই মানুষ হোক না কেন, পিতা সব সময়ই তার সন্তানকে একই রকমভাবে ভালোবাসেন। সন্তানের মঙ্গলচিন্তা সব পিতারই সহজাত আকাঙ্ক্ষা। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সকল পিতার পিতৃত্বের সর্বজনীন ও চিরন্তন রূপ উন্মোচন করেছেন।

লেখক-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি **১৮৬১** খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, **১২৬৮** বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন; কিন্তু পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। স্বশিক্ষা ও সাধনার একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত– সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আশ্চর্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ এবং চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা তিনি। রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক।

২০২৬

ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে *কৈশোরক* নামক সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. সাধুরীতিতে লেখা ১০টি গল্পের তালিকা তৈরি করো (একক কাজ)।

খ. পাঠ্য বইয়ের ১টি করে সাধু ও চলিতরীতির গদ্য অবলম্বনে রীতি দুটোর ৫টি পার্থক্য বের করো(দলীয় কাজ)।

গ. সাধুরীতির একটি অনুচ্ছেদ চলিতরীতিতে রূপান্তর করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে শঙ্কিত স্বভাবের মানুষটি কে?

ক. রহমত খ. মিনির মা

গ. রামদয়াল ঘ. মিনির বাবা

২. মিনির বাবার মনে একটু ব্যথা বোধ হয়েছিল কেন?

ক. মিনি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বলে

খ. রহমতকে কারাগারে যেতে দেখে

গ. মিনির সাথে রহমতের দেখা না হওয়ায়

ঘ. রহমতের মেয়ের কথা ভেবে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফাতেমা চৌধুরী অফিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই একটি পথশিশুকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেন। একদিন তিনি ছেলেটিকে কিছু খাবার দিতে চাইলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের চেষ্টায় ছেলেটি তার সাথে নানা গল্পে মেতে ওঠে। এখন প্রায়দিনই তিনি ছেলেটির জন্য বাসায় তৈরি খাবার নিয়ে আসেন। কখনো তার দেখা না পেলে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

৩. উদ্দীপকের ফাতেমা চৌধুরীর সাথে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?

ক. রহমত খ. মিনির মা

গ. লেখক ঘ. মিনি

৪. উদ্দীপকে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের যে দিক ফুটে উঠেছে তা হলো–

i. সন্তান-বাৎসল্য

ii. সহমর্মিতা

iii. সহযোগিতা

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১ : নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার সাথে ছেলের বেশি ভাব-বন্ধুত্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না আবীরের মা। তিনি স্বামীকে বোঝান— বিভিন্ন ফন্দি করে অনেকে এখন অন্যের বাচ্চা চুরি করে। সামাদ মিয়াও তো একদিন তেমন কিছু করে বসতে পারে।

উদ্দীপক-২ : বারো বছর আগের ছোট্ট আবীর আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে। রক্তের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন। খবর পেয়ে সামাদ মিয়া ছুটে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন – 'সাহেব, আবীর বাবার জন্য আমার সব রক্ত নেন, আমার নিজের ছেলেরে হারাইছি, ওরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।'

ক. কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে কী ছিল?

খ. 'আমিতো সওদা করিতে আসি না।' — কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপক-১ অংশে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন কাবুলিওয়ালা গল্পের মূল ভাবকেই ধারণ করে আছে।'— বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১। কাবুলিওয়ালা কে? তার পরিচয় দাও।

২। কাবুলিওয়ালা মিনিকে কেন বিনে পয়সায় সওদা দিয়ে যেত?

৩। রহমতের জেল হয়েছিল কেন?

৪। মিনির মা কাবুলিওয়ালা সম্পর্কে সম্পুর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না কেন?

লখার একুশে

আবুবকর সিদ্দিক

লখার রাতের বিছানা ফুটপাতের কঠিন শান। এই শান দিনের বেলায় রোদে পুড়ে গরম হয়। রাতে হিম লেগে বরফের মতো ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা শানে শুয়ে লখার বুকে কাশি বসে। গায়ে জ্বর ওঠে।

বাপকে লখা দেখেনি। চেনে না। মা তার ত্যানাখানি পরে দিনভর কেঁদে-কেঁদে ভিখ মেঙে ফেরে। লখার দিন কাটে গুলি খেলে, ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করে আর খাবারের দোকানের এঁটোপাতা চেটে। রাতে মায়ের পাশে লখা খিদের কষ্ট ভুলে যায়।

এই লখা, ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যার, সে আজ ভোররাতে মায়ের পাশ থেকে উঠে পড়ল। মা মুখ হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। লখা চুপি চুপি পা ফেলে হারিয়ে গেল ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে।

খানিকটা এগিয়ে উঁচু রেললাইন যেন দুটো মরা সাপ। পাশাপাশি শুয়ে আছে চুপচাপ। লখা ইটের টুকরো দিয়ে ইস্পাতের লাইনে ঠুক-ঠুক ঠুকে তার উপর কান পাতল। হ্যাঁ, শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন গানের সুরলহরি বয়ে যাচ্ছে কানের ভিতর দিয়ে। লখা ভারি মজার দুষ্টু ছেলে। গানের মজা ফুরিয়ে গেলে পর এক লাফে লাইন পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে গেল। সেখানে মস্ত নিচু খাদ। তার ভিতর গড়িয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবে নির্ঘাত। খুব সাবধানে খাদ পেরিয়ে ওপারের ডাঙায় উঠে এলো সে। ডাঙাটা আসলে বনজঙ্গলে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে আর ধেড়ে ধেড়ে গাছের ঝাঁকড়া ছায়া মাথা নেড়ে নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে লখাকে।

খচ করে কাঁটা ঢুকে গেল বাঁ পায়ে। কীসের কাঁটা? হবে হয়তো বাবলা-টাবলার। লখা উবু হয়ে বসে কাঁটাটা খসিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো। কিন্তু বিষ তো যায় না। কী অসহ্য যন্ত্রণা! আঁ আঁ বলে কেঁদে দিল লখা। কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। সময় নেই আর। তাকে যে যেতেই হবে। আবছা অন্ধকার। ফিনফিনে ঠান্ডা।

গাছের পাতা বেয়ে শিশির গড়িয়ে পড়ছে। খুক খুক করে কাশি আসছে লখার। খালি গা শিশিরে ভিজে শীত লাগছে। একটা ছ্যাঁচড়া ডাল লখার হাফপ্যান্টটা টেনে ধরেছে পিছন দিক দিয়ে। প্যান্ট আধখসা অবস্থায় দৌড়াতে লাগল সে।

একটা খেঁকশেয়াল বুঝি তাকিয়ে দেখছিল তাকে। দেখুক গে। এখন ভয় ভয় করলে দেরি হয়ে যাবে। কাজেই এবার চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো তাকে। আর শেষটায় সেই অদ্ভুত গাছটার নিচে পৌঁছে গেল লখা, যার ডালে ডালে রক্তের মতো টুকটুকে লাল ফুল। দিনের বেলায় রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে থোকা থোকা ফুলের লাল ঝুঁটির পানে তাকিয়ে থাকে সে। এখন ওই উপরের এক থোকা ফুল তার পেড়ে আনা চাই।

হাতের মুঠো পাকিয়ে মনটাকে শক্ত করে নিল লখা। তারপর চড় চড় করে গাছে উঠে গেল। একেবারে কাঠবেড়ালির বাচ্চা যেন। মগডালের কাছাকাছি এসে কয়েকটা তুলোমিঠের মতো বড়ো বড়ো থোকা পেয়ে গেল সে। শিশিরে ভেজা তুলতুলে। তা হোক, তোমরা এখন আমার। নাও সব টুপটাপ নেমে এসো তো আমার মুঠোর মধ্যে। কষ্ট লাগছে। আহা! কীসের কষ্ট? এই তো একটু পরে আমি তোমাদের এমন একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে রেখে দেবো, যেখান অবধি তোমরা এই গাছের মগডালে কোনোদিন উঠতে পারবে না। এসো, এসো, লক্ষ্মীসোনারা সব নেমে এসো তো।

ফুল নিয়ে যখন মাটিতে নেমে এলো লখা, তখন সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে তার। কনুই ও বুকে চটচটে ঠান্ডা। হাত দিয়ে টের পায়, টাটকা রক্ত। গাছের ডালপালা কাঁটায় ভর্তি। গা-হাত-পা ছিঁড়ে গেছে আঁচড় লেগে। তাতে কী! জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার।

সেদিন সকাল ছিল বড় আশ্চর্য সুন্দর। আকাশে হালকা কুয়াশা। অল্প অল্প শীত। আর দক্ষিণের সামান্য বাতাস। পথে পথে মিছিলের ঢল নেমেছে। শত শত মানুষ। হাতে ফুলের গুচ্ছ। ঠোঁটে প্রভাতফেরির গান। ধীর পায়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ভিড়ের মধ্যে ক্ষুদে টোকাই লখাকে ঠিকই দেখা যাচ্ছে। তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। কারণ মিছিলের সবার গায়ে চাদর, কোট, সোয়েটার। শুধু তার গা খোলা উদাম, গাঢ় কালো। হাত উপচে পড়ছে রক্তলাল ফুলের গুচ্ছ। মিছিলে পা মিলিয়ে সেও চলেছে শহিদ মিনারে ফুল দিতে। সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে চলছে — আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? কিন্তু তার গলা দিয়ে কথা তো ফোটে না, শুধু শব্দ হয় আঁ আঁ আঁ আঁ।

আসলে কথা ফুটবে কী করে! লখা যে জন্মবোবা। বাংলা বুলি তার মুখে ফুটতে পায় না। সে মনে মনে বলে — অ আ ক খ। বাইরে শব্দ হয় — আঁ আঁ আঁ আঁ ।

শব্দার্থ ও টীকা

শান	–	পাথর। এখানে কংক্রিটে তৈরি ফুটপাত বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।
ত্যানাখানি	–	পুরোনো ছেঁড়া কাপড়।
ভিখ	–	ভিক্ষা, খয়রাত।
মেঙে	–	চেয়ে।
গুলি খেলা	–	মার্বেল দিয়ে খেলা।

ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যার – যে নিজের ছায়াকেও ভয় পায়। খুব ভীতু।

বিষ – যে পদার্থ শরীরে ঢুকলে যে কোনো প্রাণী অসুস্থ হয়, কখনো কখনো মারাও যায়। এখানে পথে কাঁটা ফোটার জন্য 'ব্যথা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

তুলোমিঠে – তুলোর মতো দেখতে মিষ্টি খাদ্য বিশেষ। একে 'হাওয়াই মিঠাই'- ও বলে।

মগডাল – গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল।

গাঢ় – ঘন।

প্রভাতফেরি – ভোরবেলা দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে সবাইকে জাগিয়ে তোলার অনুষ্ঠান বিশেষ। কিন্তু বাংলাদেশে প্রভাতফেরি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন হয়। তখন ছিল পাকিস্তানি আমল। তৎকালীন সরকার সে-দাবি মানেনি। ফলে ছাত্র-জনতা তীব্র আন্দোলন করতে থাকে। সেই আন্দোলন চরমে ওঠে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে সরকারের পুলিশ গুলি চালায়। তাতে শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। তারই স্মরণে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরি করা হয়। প্রভাতফেরিতে সকলের কণ্ঠে থাকে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত এবং শহিদ আলতাফ মাহমুদের সুর করা গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'।

শহিদ মিনার – শহিদের স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্মিত মিনার। ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সন্নিকটে আমাদের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার অবস্থিত।

পাঠের উদ্দেশ্য

ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

পাঠ-পরিচিতি

গল্পটিতে একুশে ফেব্রুয়ারির অবিনাশী প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। অতি সাধারণ এক কিশোর লখা। কথা বলতে পারে না সে। কিন্তু তাতে কীই-বা আসে যায়। লখা উঁচু ডালে উঠে লাল ফুল সংগ্রহ করে শহিদ মিনারে যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কথা বলতে না পারলেও তার মুখ দিয়ে আঁ আঁ আঁ আঁ ধ্বনির মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে বাঙালির গর্বের উচ্চারণ — 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুবকর সিদ্দিক ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : *জলরাক্ষস*, *খরাদাহ*, *একাত্তরের হৃদয়ভস্ম*, *বারুদ পোড়া প্রহর* ইত্যাদি। তিনি ২০২৩ সালে খুলনায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. শহিদ দিবসের ওপর শিক্ষার্থীরা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

খ. শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটিকা ইত্যাদির সমন্বয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ করবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লখা কখন তার খিদের কষ্ট ভুলে যায়?

ক. ঘুমুতে গেলে খ. মাকে কাছে পেলে

গ. খেলার সঙ্গী পেলে ঘ. প্রভাতফেরির গান শুনলে

২. লখাকে চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো, কারণ —

ক. সে ভয় পেয়েছিল

খ. বাইরে অন্ধকার ছিল

গ. তাকে ফুল আনতে হবে

ঘ. মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাবার সাথে প্রভাতফেরিতে এসেছে দিপু। ওর হাতে একটা টকটকে লাল গোলাপ। ওর কণ্ঠে গানের সুর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'। প্রভাতফেরির ভিড় ঠেলে সে লাল গোলাপটিকে শহিদ মিনারের সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে রাখতে সক্ষম হয়।

৩. লখা ও দিপুর মধ্যে যে বিষয়ে মিল আছে তা হলো —

ক. শহিদ মিনারে আসা মানুষ দেখার ইচ্ছা

খ. শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আবেগ

গ. প্রতিবন্ধকতা দূর করার অদম্য বাসনা

ঘ. শহিদ দিবসের গান গাওয়ার আগ্রহ

৪. দিপু ও লখা দুজনেই শহিদ দিবস উদযাপন করে প্রমাণ করেছে যে —

i. ভালোবাসার অনুভূতি প্রতিবন্ধকতার চেয়ে শক্তিশালী

ii. আত্মবিশ্বাস দ্বারা বাধাকে অতিক্রম করা যায়

iii. শিশুরা অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ

২০২৬

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ইশতিয়াক এবার বৃত্তি নিয়ে জাপানে লেখাপড়া করতে চলে আসায় শহিদ দিবস উদ্‌যাপন করতে পারবে না। অথচ প্রতিবছর সে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করত — বক্তৃতা, আবৃত্তি, আলোচনা শুনত, সে-কথা মনে করে তার চোখ জলে ভরে আসে। মনে মনে কিছু করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর ইশতিয়াক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও এর ইতিহাস সহপাঠীদের কাছে তুলে ধরে। অন্যদিকে দেশে থেকেও তার বাল্যবন্ধু হাবিব অফিসে কাজ করতে গিয়ে বা কথা বার্তায় বাংলা ব্যবহার করতেই চায় না। সন্তানকে *শহীদ দিবস* সম্পর্কে কিছু জানাতেও তার অনীহা রয়েছে।

ক. লখা রাতে কোথায় ঘুমায়?

খ. 'জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার।' — কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের হাবিবের সাথে 'লখার একুশে' গল্পের লখার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষা লখার শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।' — বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১। কীভাবে লখার দিন কাটে?

২। প্রভাতফেরি কী? বুঝিয়ে লেখো।

৩। লখা গাছ থেকে লাল ফুল সংগ্রহ করেছিল কেন?

৪। লখা কীভাবে জিতে গেলো?

মরু-ভাস্কর

হবীবুল্লাহ্ বাহার

যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে – মানুষের জীবনে যাঁরা এনেছেন সৌষ্ঠব, ফুটিয়েছেন লাবণ্য, মরুভাস্কর হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে সকলের আগে আমাদের চোখে পড়ে তাঁর ঐতিহাসিকতা। হজরতের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিবরণ যেভাবে রক্ষা করা হয়েছে, সত্যের কষ্টিপাথরে ঘষে যেভাবে যাচাই করা হয়েছে, পৃথিবীর কোনো মহাপুরুষের বেলায় তা করা হয়নি।

আরবের লোকের স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যি অসাধারণ। বিরাট বিরাট কাব্যগ্রন্থ সহজেই তারা মুখস্থ করে ফেলত। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মুখস্থ না করে কোনো কিছু লিখে রাখা আরবরা লজ্জার কথা বলে মনে করত। সাহাবিরা এবং অন্য হাদিসজ্ঞরা অনেকেই হাজার হাজার হাদিস মুখস্থ করে রাখতেন।

হজরত মোস্তফা (স.) মানবতার গৌরব। আল্লাহ্‌র নবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন এবং সেভাবেই তিনি জীবনযাপন করেছেন। ৬৩ বছরের ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে হজরতকে কত পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখলে অবাক হতে হয়। যিনি ছিলেন এতিম, তিনি হয়েছিলেন সারা আরবভূমির অবিসংবাদিত নেতা। হজরত যখন মদিনার অধিনায়ক, তখন তাঁর ঘরের আসবাব ছিল – একখানা খেজুর পাতার বিছানা আর একটি পানির সুরাহি। অনেক দিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হত এবং অনেক সময় উনুনে জ্বলত না আগুন।

হজরতের চরিত্রে সংমিশ্রণ হয়েছিল কোমল আর কঠোরের। বিশ্বাসে যিনি ছিলেন অজেয়, অকুতোভয়, সত্যে ও সংগ্রামে যিনি বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল, তাঁকেই আবার দেখতে পাই – কুসুমের চেয়েও কোমল। বন্ধু-বান্ধবের জন্য তাঁর প্রীতির অন্ত নেই – মুখ তাঁর সব সময় হাসিহাসি, ছেলেপিলের সঙ্গে মেশেন তিনি একেবারে শিশুর মন নিয়ে – পথে দেখা হলে বালক-বন্ধুকে তার বুলবুলির খবর জিজ্ঞেস করতে তাঁর ভুল হয় না। বন্ধুবিয়োগে চক্ষু তাঁর অশ্রুসিক্ত হয়। বহু দিন পর দাই-মা হালিমাকে দেখে 'মা আমার, মা আমার' বলে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন। মক্কাবিজয়ের পর সাফা পর্বতের পাদদেশে বসে হযরত বক্তৃতা করছিলেন। একজন লোক তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হজরত অভয় দিয়ে বললেন: "ভয় করছ কেন? আমি রাজা নই, কারও মুনিবও নই – এমন মায়ের সন্তান আমি, শুষ্ক খাদ্যই যাঁর আহার্য।"

হজরত জীবনে কাউকে কড়া কথা বলেননি – কাউকে অভিসম্পাত দেননি। আনাস নামক এক ভৃত্য দশ বছর হজরতের চাকরি করার পর বলেছেন – এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হজরতের মুখে তিনি কড়া কথা শোনেননি কখনো। মক্কায় বা তায়েফে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও হজরতের মুখে অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারিত হয়নি। বরং তিনি বলেছেন, "এদের জ্ঞান দাও প্রভু – এদের ক্ষমা করো।"

জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা মোস্তফা চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও দাস-ব্যবসায়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মানবাত্মা যখন গুমরে মরছিল, রাসুলুল্লাহ্ (স.) তখন প্রচার করেন সাম্যের বাণী।

সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। চরম দুরবস্থার হাত থেকে দাসদের পরিত্রাণের জন্যও তিনি কাজ করেছেন। মানুষকে সালাতে আহ্বান করার জন্যে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেছেন হাবশি গোলাম হজরত বেলালকে।

নারীর অবস্থার পরিবর্তন এনেছেন হজরত। নারীর মর্যাদা ছিল তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কন্যা হজরত ফাতেমা (রা.)-কে কেন্দ্র করে সে যুগে গড়ে উঠেছে নারীত্বের আদর্শ। হজরত ঘোষণা করেছেন: "বেহেশত মায়ের পায়ের নিচে।"

কুসংস্কারকে হজরত কোনো দিনই প্রশ্রয় দেননি। একবার হজরতের পুত্রের মৃত্যুদিনে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। লোকে বলাবলি করতে থাকে – বুঝি হজরতের বিপদে প্রকৃতি শোকাবেশ পরিধান করেছে। তখনি সভা ডেকে হজরত এই বাস্তবতাবিরোধী কথার প্রতিবাদ করলেন; বললেন, "আল্লাহ্‌র বহু নিদর্শনের মধ্যে দুটি – চন্দ্র ও সূর্য। কারুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র – সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না।"

হজরত জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন সব সময়। জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো – তাকে তিনি খুঁজে বের করতে বলেছেন যেখান থেকেই হোক। আরও বলেছেন তিনি: "জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহিদের লহুর চাইতেও পবিত্র।"

এভাবে জ্ঞানের আলোয় মানুষের হৃদয় উজ্জ্বল করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন তিনি।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

২০২৫

শব্দার্থ ও টীকা

মরু-ভাস্কর – মরুভূমির সূর্য। এখানে হজরত মুহাম্মদ (স.)-কে বোঝানো হয়েছে।
সৌষ্ঠব – সুগঠন।
হাদিস – হজরত মুহাম্মাদ (স.)-এর অনুমোদিত বাক্য ও কাজের সমষ্টি।
কষ্টিপাথর – ঘষে সোনা পরীক্ষা করার এক রকম কালো পাথর।
সুরাহি – পানির এক রকম পাত্র, সোরাই, জলের কুঁজো।
অকুতোভয় – যার কোনো কিছুতে ভয় নেই, নির্ভীক।
অভিসম্পাত – অভিশাপ।
পরিত্রাণ – মুক্তি।
হাবশি গোলাম – আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) জন্মগ্রহণকারী ক্রীতদাস।
লহু – রক্ত।

পাঠের উদ্দেশ্য

মহামানবদের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

পাঠ- পরিচিতি

মরু-ভাস্কর প্রবন্ধে লেখক মহানবির জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন যা আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার বিকাশে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মদ (স.) মানবপ্রেমে, জীবপ্রেমে মহীয়ান ছিলেন। বিপদে ধৈর্যশীলতা, দারিদ্র্যে অচঞ্চলতা, শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীলতার মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁর জীবন সমুজ্জ্বল। হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের যত তথ্য পাওয়া যায় সবই ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত।

মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হওয়া সত্ত্বেও হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন সাধারণ মানুষের মতো। তাই তিনি মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

মহানবির ৬৩ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে, নানা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর জীবনের মূলধারা ছিল অপরিবর্তিত। তিনি সব সময় সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন। তাঁর চরিত্রে মিশে ছিল হাসিখুশি ভাব, কোমলতা ও কঠোরতা। আপন বিশ্বাসে, সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল। অপরদিকে সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। তাঁর চরিত্র ছিল প্রীতিতে, মমতায়, স্নেহে, সৌজন্যে দয়ার আধার। জীবনে কাউকে তিনি কড়া কথা বলেননি, কাউকে অভিসম্পাত দেননি। নিজে নির্যাতিত হয়েও প্রতিদানে তিনি তাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

হজরত মানুষে মানুষে ভেদাভেদের পরিবর্তে সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি চরম দুরবস্থা-কবলিত ক্রীতদাসের পরিত্রাণের জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অবস্থার পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু।

হজরত কুসংস্কারকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। যা সত্য, যা যুক্তিগ্রাহ্য, তার পক্ষেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন। হজরত মুহাম্মদ (স.) জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। এর ফলে মুসলিম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

হবীবুল্লাহ্ বাহার ছিলেন কবি নজরুলের 'ভক্তশিষ্য' এবং চিন্তা ও কর্মে পুরোপুরি মানবতাবাদী। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মূলত প্রবন্ধকার হলেও তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন *ওমর ফারুক*, *আমীর আলী* ইত্যাদি। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাঁদের অনুসরণে ৫টি কল্যাণকর কাজের তালিকা তৈরি করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হজরত মুহাম্মদ (স.) কোন ক্ষেত্রে বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন?

ক. গভীর আত্মবিশ্বাসে খ. নারীর মর্যাদা রক্ষায়

গ. সত্য ও সংগ্রামের চেতনায় ঘ. সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়

২. 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু – এদের ক্ষমা কর।' –উক্তিটির মধ্য দিয়ে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রাধান্য পেয়েছে?

ক. ক্ষমা ও মহানুভবতা খ. দয়া ও করুণা

গ. প্রেম ও ভালোবাসা ঘ. বাৎসল্য ও ন্যায়বিচার

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

করিম সাহেব অনেক সম্পদশালী আর খ্যাতিমান হলেও সাদামাটা জীবন যাপন করেন। দরিদ্র অসহায় মানুষকে সাহায্য করেন। কিন্তু নাম প্রচার করতে দেন না। গৃহকর্মী হালিমা বলে– করিম চাচা আমাদের যা খেতে দেন, তিনি নিজেও তা-ই খান।

৩. উদ্দীপকের হালিমার কথায় করিম চাচার চরিত্রের মধ্যে মরু-ভাস্কর রচনার কোন বিষয়টি সুস্পষ্ট লক্ষ করা যায়?

ক. দানশীলতা খ. সহমর্মিতা

গ. সাম্যবাদিতা ঘ. ন্যায় বিচার

৪. উদ্দীপকের করিম সাহেব 'মরু-ভাস্কর' রচনার প্রতিনিধিত্ব করে-

i. মরু-ভাস্করের জীবন যাপনে

ii. মুহাম্মদ (স.) এর মানবিক গুণাবলিতে

iii. কোমলতা আর কঠোরতার সংমিশ্রণে

কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. ii, iii
গ. i, iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। হজরত মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কোনো অহমিকা তাঁর ছিল না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল হাসিমাখা। ছোটো শিশুদের তিনি খুব বেশি স্নেহ করতেন। তাঁর বালক-বন্ধুর সাথে দেখা হলে তিনি বন্ধুর বুলবুলি পাখির খবর নিতেও ভুলে যেতেন না।

ক. মানবতার গৌরব কাকে বলা হয়?

খ. শহিদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানসাধকের কলমের কালিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলার কারণটি ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা 'মরু-ভাস্কর' প্রবন্ধের আলোকে বর্ণনা করো।

ঘ. "উদ্দীপকটিতে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর গুণাবলির আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।"-বক্তব্যটির যৌক্তিকতা 'মরু-ভাস্কর' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২. আবির সাহেব যে কোনো বয়সী নারীকে অত্যন্ত সম্মান করেন। কিন্তু তার স্ত্রী আমিনা বেগম তার ছেলে আকাশকে মেয়ের থেকে বেশি গুরুত্ব দেন। বলেন— আকাশ তোমার বংশের প্রদীপ। সে শিক্ষিত হলে সংসারের হাল ধরতে পারবে। আবির সাহেব তাকে বোঝান— জ্ঞান অর্জন সবার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল নারীরাও সবক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। ইসলামের শিক্ষা হলো— মানুষে মানুষে বৈষম্য করা উচিত না।

ক. হাদিস কী?

খ. হজরত মুহাম্মদ (স.) কে মরু-ভাস্কর বলা হয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকের কোন চরিত্রের সাথে 'মরু-ভাস্কর' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আবির সাহেবের মধ্যে হজরত মুহাম্মদ (স.) এর গুণাবলির সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেনি- 'মরু-ভাস্কর' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। আরবিরা কোন কিছু লিখে রাখাকে লজ্জার কথা বলে মনে করত কেন?

২। শিশুদের প্রতি মহানবি (স.) কেমন আচরণ করতেন?

৩। মহানবি (স.) কীভাবে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন করলেন?

৪। জ্ঞানার্জন সম্পর্কে মহানবি (স.) কী বলেছেন?

শব্দ থেকে কবিতা

হুমায়ুন আজাদ

কবিতা কাকে বলে, বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারি, তারা কম-বেশি কবিতা চিনি। কবিতারও চেহারা আছে। বইয়ে বা পত্রিকায় যে-লেখাগুলো খুব সুন্দরভাবে ছাপানো হয়, যে-লেখাগুলো, পঙ্‌ক্তিগুলো খুব বেশি বড় হয় না, যে-গুলোতে একটি পঙ্‌ক্তি আরেকটি পঙ্‌ক্তির সমান হয়, সে-লেখাগুলোই কবিতা। যে-লেখাগুলো পড়লে মন নেচে ওঠে; গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রং-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা। যা পড়লে, দু-তিনবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মনের ভেতর যা নাচতে থাকে, তা-ই কবিতা।

কবিতা কারা লেখেন? কবিরা লেখেন কবিতা। তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন। আমরা যদি কিছু বানাতে চাই, তাহলে কিছু-না-কিছু জিনিস লাগে। উপমা একটি ঘুড়ি বানাতে চায়। ঘুড়ি বানানোর জন্যে উপমার দরকার লাল-নীল কাগজ, সুতো, বাঁশের টুকরো। মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায়। তার দরকার হলদে টুকরো কাপড়, সুতো, তিনটা লাল বোতাম, দুটো সবুজ কাঁটা, একটু তুলো। তেমনি কবিতা বানাতে হলেও জিনিস চাই। কবিতার জন্যে দরকার শব্দ — রংবেরঙের শব্দ। 'পাখি' একটা শব্দ, 'নদী' একটা শব্দ, 'ফুল' একটা শব্দ, 'মা' একটা শব্দ; এমন হাজারো শব্দের দরকার হয় কবিতা লেখার জন্যে। কবি হতে পারে কে? সে-ই হতে পারে কবি, যে লিখতে পারে কবিতা, যার ভালোবাসা আছে শব্দের জন্যে। যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে

যে খুব সুখ পায়, সে-ই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধভরা কথা বলতে, চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা? বানাতে চাও নূপুরের শব্দের মতো ছড়া? যদি চাও তবে তোমাকে সারাদিন ভাবতে হবে শব্দের কথা। খেলতে হবে শব্দের খেলা। নানান রকমের শব্দ আছে আমাদের ভাষায়। তোমাকে জানতে হবে সে-সব শব্দকে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর গায়ে হলুদ-সবুজ-লাল-নীল -বাদামি-খয়েরি রং আছে। তোমাকে চিনতে হবে শব্দের রং। অনেক শব্দ আছে, যেগুলোর শরীর থেকে সুর বেরোয় : কোনো কোনো শব্দে বাঁশির সুর শোনা যায়, কোনো কোনো শব্দে শোনা যায় হাসির সুর। কোনো শব্দে বাজে শুকনো পাতার খসখসে আওয়াজ, কোনোটিতে বেহালার সুর। কোনো কোনো শব্দ তোমার পায়ের নূপুরের মতো বাজে। তোমাকে শুনতে হবে শব্দের সুর ও স্বর। অনেক শব্দ আছে বাংলা ভাষায় যেগুলোর শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোয়। কোনোটির শরীর থেকে ভেসে আসে লাল গোলাপের গন্ধ, কোনোটির গা থেকে আসে কাঁঠালচাঁপার ঘ্রাণ, কোনোটি থেকে আসে বাতাবিলেবুর সুবাস। তুমি যদি দেখতে পাও শব্দের শরীরের রং, শুনতে পাও শব্দের সুর, টের পাও শব্দের সুগন্ধ, তাহলেই পারবে তুমি কবি হতে।

কবিরা শব্দ দিয়ে লেখেন নানান রকমের কবিতা। কখনো তাঁরা খুব হাসির কথা বলেন, কখনো বলেন কান্নার কথা। কখনো তাঁরা বলেন স্বপ্নের কথা, কখনো তাঁরা চারপাশে যা দেখেন, তার কথা বলেন। কিন্তু সব সময়ই তাঁরা কথা বলেন শব্দে। শব্দ বসিয়ে বসিয়ে তাঁরা বানান কবিতা। কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানান রকমের শব্দ। তারপর আসে শব্দ দিয়ে যা বলতে চাই, তার কথা। কিন্তু কীভাবে বলা যায় সেই কথা?

কবিতায় আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। কখনো বলতে পারি ঘর-ফাটানো হাসির কথা। বলতে পারি টগবগে রাগের কথা। বলতে পারি খুব চমৎকার ভালো কথা। কখনো বাজাতে পারি নাচের শব্দ। আবার কখনো আঁকতে পারি রঙিন ছবি। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে, ওই কথা নতুন হতে হবে। যা একবার কেউ বলে গেছে, যে-ছবি একবার কেউ এঁকে গেছে, তা বলা যাবে না, সে-ছবি আঁকা যাবে না। আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে। তাই কবিতা লিখতে হলে শব্দকে জানতে হবে, জানতে হবে ছন্দ, আর থাকতে হবে স্বপ্ন। যার চোখে স্বপ্ন নেই, সে কবি হতে পারে না। স্বপ্ন থাকলে মনে আসে নতুন ভাবনা, নেচে নেচে আসে ছন্দ, আর শব্দ।

যে কোনো বিষয় নিয়েই তুমি লিখতে পারো কবিতা। বাড়ির পাশের গলিটা, দূরের ধানক্ষেতটা, পোষা বেড়ালটা বা পুতুলটাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্বপ্ন থাকে। রাস্তার দোকানিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। আর যা নেই, তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। এবার একটা কবিতা লেখা যাক। কবিতাটির নাম দিচ্ছি 'দোকানি'। রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে তুমি-আমি চিনি। সে বিক্রি করে সাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট, লাল পুতুল, সবুজ পান। এসব জিনিস আমরা কিনে খাই, দোকানিকে চকচকে টাকা দিই। তার জিনিসপত্র বিক্রি দেখে মাথায় আমার একটা ভাব এলো। ভাবটা হলো: আমি একটা দোকান খুলেছি দুদিন ধরে, কিন্তু সে-দোকানে দুধ, চকোলেট, পান বিক্রি হয় না।

২০২৩

বিক্রি হয় এমন সব জিনিস, যা কেউ বেচে না, যা কেউ কেনে না। শুধু স্বপ্নেই সে-সব জিনিস বেচাকেনা চলে। ভাবটা মাথায় এলো, সঙ্গে শব্দ এলো, আর ছন্দ এলো। প্রথমে লিখলাম:

দুদিন ধরে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকটুকে লাল পাখির গান।

কথাটাই চমক দেয় সবার আগে: চকচকে চাঁদের আলো, টুকটুকে লাল পাখির গান বিক্রির ব্যাপারটা বেশ নতুন। সারা পৃথিবীতে খুঁজে এমন দোকান পাওয়া যাবে না। ছন্দটাও বেশ, দুলে দুলে আসছে। এ-তিনটি পঙ্‌ক্তি পড়ার সাথে সাথে শব্দ, ছন্দ, কথা মিলে এক রকম স্বপ্ন তৈরি হয় চোখে আর মনে। এরপর আরও এগিয়ে গিয়ে লিখলাম:

বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ।

এখানে ছন্দ-মিল আরও মধুর। বিক্রির জিনিসগুলো আগের মতোই চমকপ্রদ। তবে এখানে স্বপ্ন আরও বেড়েছে, ছবিও আরও রঙিন। চাঁপার গন্ধ পাওয়া গেল এবং বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নূপুর। এ-নাচ স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, এমন নাচ নাচতে পারে না কেউ। 'গোলাপ ফুলের মুখের রূপ' বলার সাথে সাথে গোলাপ ফুল একটি মিষ্টি মেয়ের মতো ফুটে উঠল, মেয়েটির মুখ হয়ে উঠল গোলাপ, আর গোলাপ হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ। স্বপ্ন জড়ো হলো চোখে।

কবিতাটিকে আমি আর লিখতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরা লিখতে পার। কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে-কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক। তোমরা এখন ছোটো, এ-ছোটো থাকার সময়টা বেশ সুন্দর। বারবার আমার ছোটো সময়ের কথা মনে পড়ে। আমি দেখতে পাই, ছোট আমি দাঁড়িয়ে আছি পুকুরের পাড়ে, একটা সাদা মাছ লাফ দিয়ে আবার ঢুকে গেল পানিতে। দেখতে পাই শাপলা ফুটেছে, পানি লাল হয়ে গেছে। একটা চড়ুই উড়ে গেল, তার ঠোঁটে চিকন একটা কুটো। এসব আমাকে কবিতা লিখতে বলে।

তোমরা এখন ছোটো, এ বয়সে তোমরা খুব বেশি করে দেখে নেবে। যত পার, দেখ। দেখ, দেখ এবং দেখ। বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ছবি জমাও, রং জমাও, সুর জমাও। বড় হলে এ ছবি, সুর, রং তোমাদের খুব উপকার করবে। খুব ছোটো বয়সে কি কবিতা লেখা উচিত? ছোটো বয়সে উচিত কবিতা পড়া, পড়া এবং পড়া। চারদিকের ছবি দেখা, দেখা এবং দেখা। ছোট বয়সে বুকে জমানো উচিত শব্দ আর ছন্দ। তারপর একদিন, যখন বড়ো হবে, শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং সব দল বেঁধে আসবে তোমার কাছে, বলবে আমাদের তুমি কবিতায় রূপ দাও। তুমি হয়তো একা একা ঘরে বসে শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিস, যার নাম কবিতা।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

উপমা	–	তুলনা। এখানে একটি মেয়ের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
নূপুর	–	পায়ে পরার অলংকার।
চমকপ্রদ	–	যা অবাক করে দেয়।
কাঁঠালচাঁপা	–	পাকা কাঁঠালের মতো গন্ধযুক্ত ফুল।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল হতে অনুপ্রাণিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে একটি হচ্ছে কবিতা। রচনাটিতে কবিতার শিল্পরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য অপরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কাকে বলা যায় কবিতা? লেখকের মতে, যা পড়লে মনের ভিতর স্বপ্ন জেগে ওঠে, ছবি ভেসে ওঠে, তা-ই কবিতা। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে লেখা হয় কবিতা।

কেবল কবিরাই লিখতে পারেন কবিতা। কেননা কবিরাই স্বপ্ন দেখতে পারেন, তাঁরাই পারেন স্বপ্নের ছবি আঁকতে। নতুন ছবি নতুন ভাব কেবল কবিদের চেতনায় খেলা করে বলে তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা। কবিতা লিখতে হলে শব্দের রূপ-রং-গন্ধ-বর্ণ-সুর ও ছন্দ চিনতে হয়, জানতে হয়। কবিরা চেনেন এবং জানেন শব্দের এসব মায়াবী রূপ। তাই তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা।

অনেক বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা যায়। তবে কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্বপ্ন। যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন না, তিনি লিখতে পারেন না কবিতা। স্বপ্ন দেখার জন্য শৈশব-কৈশোরে পড়তে হবে কবিতার পর কবিতা, দুচোখ মেলে দেখে নিতে হবে যা-কিছু চোখে পড়ে, তার সবটা। অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য চাই অভিজ্ঞতা। কবিতার রূপ ও তার রচনা-কৌশল বর্তমান রচনার উপজীব্য।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক ও কবি হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: কাব্য— 'অলৌকিক ইস্টিমার', 'জ্বলো চিতাবাঘ', 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে', 'কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু'; উপন্যাস — 'ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল', গল্প — 'যাদুকরের মৃত্যু', প্রবন্ধ — 'লাল নীল দীপাবলি', 'কতো নদী সরোবর' ইত্যাদি।

হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার পড়া কোনো কবিতা বা গল্প অবলম্বনে তোমার ভালো লাগা বা ভালো না-লাগাগুলো যুক্তিসহকারে লেখো।

খ. টেলিভিশন বা অন্য কোনো মিডিয়াতে তোমার দেখা কোনো নাটক নিয়ে একটি সমালোচনা লেখো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই কোনটি জানতে হবে?

ক. কথা খ. কৌশল

গ. শব্দ ঘ. ছন্দ

২০২৩

২. "শুধু স্বপ্নেই সেসব জিনিস বেচা-কেনা চলে।"– এ বাক্যে বেচা-কেনা শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. বিনিময় প্রথা খ. ক্রয়-বিক্রয়

গ. দেনা-পাওনা ঘ. আদান-প্রদান

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরির গান
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ।

৩. **কবিতাংশে 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের কবিতা রচনার কোন দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়?**

ক. শব্দ প্রয়োগ খ. ছন্দের ব্যবহার
গ. সাবলীল ভাষা ঘ. উপমার প্রয়োগ

৪. **উপর্যুক্ত বিষয়টি নিচের কোন কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?**

ক. ছবিও আরও রঙিন খ. দুলে দুলে আসছে
গ. খেলতে শব্দের খেলা ঘ. যত পারো দেখ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মাহফুজা চমৎকার কবিতা লেখেন। জীবনে বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভিতর সাজাতে পছন্দ তাঁর। মাহফুজার ভাইপো নির্ঝর তাঁকে খুব পছন্দ করে। কারণ তিনি তাঁর ভাইপো নির্ঝরকে প্রায়ই নানা রকম কবিতা শোনান। নির্ঝর ফুফুকে পেলেই ছড়া শোনার বায়না ধরে। একদিন নির্ঝর তাঁকে বলে "ফুফু তুমি এতো সুন্দর কবিতা কীভাবে লেখ?" মাহফুজা উত্তর দেন, "তুমি তোমার চারপাশের সুন্দর স্বপ্নময় শব্দগুলোকে বুঝে ধারণ করে রাখবে, দেখবে তুমিও একদিন চমৎকার কবিতা লিখতে পারবে।"

ক. কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই কোনটি প্রয়োজন?
খ. 'কবিতার জন্য দরকার শব্দ – রংবেরঙের শব্দ।' – বুঝিয়ে লেখ।
গ. কবিতার বিষয়ে নির্ঝরের প্রশ্নের উত্তর 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে – লেখ।
ঘ. মাহফুজার উত্তর 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের মূলভাবকে ধারণ করে কি? –যুক্তিসহ বিচার কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের আলোকে কবিতা কী?

২। একটি ভালো কবিতা লেখার জন্য কী কী দরকার হয়?

৩। কবিতা লেখার জন্য স্বপ্ন থাকা দরকার কেন?

৪। কবিরা তাদের কবিতায় কোন কোন বিষয়গুলো তুলে ধরেন?

২০২৫

হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.)

হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে 'উস ওয়াতুল হাসানা' বা সুন্দরতম আদর্শ। সেই জীবনের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছে, তাঁদের জীবন মহান গুণাবলিতে স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যাঁরা দিনের জন্য জীবন কুরবানি করেছেন, দুনিয়ার মানুষের বিপুল কল্যাণ সাধন করে গেছেন, তাদের মধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.)।

শুধু আলোর অভাবকেই অন্ধকার বলে না। মানুষের মনে যখন সুখ-শান্তি থাকে না, সমাজে চলতে থাকে অন্যায়, অবিচার, অরাজকতা, দেশ থেকে বিদায় নেয় আইন, শৃঙ্খলা, ধর্ম, তখন দেখা দেয় সত্যিকার অন্ধকার। এখানে এমনি এক অন্ধকার যুগের কথা বলছি।

সেই যুগটি ছিল প্রায় হাজার বছর আগের। আর সেটা ছিল গোটা মুসলিম জাহানের জন্য বড়ই দুর্দিন। তখন রোম সাম্রাজ্য ছিল খ্রিস্টানদের অধীন। তার চার পাশে রয়েছে পারস্য, সিরিয়া, মিশর এবং আরও কতগুলো মুসলিম দেশ। শক্তিতে মুসলমানগণ ছিল পরাক্রমশালী কিন্তু দেশের সর্বত্র বিরাজ করছিল হিংসা, বিদ্বেষ, অত্যাচার- অনাচার, হানা-হানি ও শোষণ।

মুসলিম জাহানে যখন এমনি দুর্দিন ঠিক সেই সময় আল্লাহর অসীম রহমত স্বরূপ হযরত আবদুল কাদির (র.) আমাদের মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেটা ছিল ১০৭৭ সাল। ৪৭০ হিজরির রমযান মাস। তাঁর জন্মস্থান ছিল পারস্য দেশের জিলান শহরে। জিলানের বাসিন্দা বলে তাঁর ভক্তরা তাঁর নামের শেষে জিলানি পদবি জুড়ে দেন। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত আবু সালেহ তখনকার দিনে একজন মশহুর আলেম এবং মাতা ছিলেন হযরত সাইয়েদা উম্মুল ফাতেমা (র.)। তিনি ছিলেন খুবই পরহেজগার মহিলা।

ছোটবেলা থেকেই হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। সমবয়সী ছেলেরা যখন খেলাধুলা, হৈ-হল্লা করত, তিনি তখন চুপচাপ বসে কী যেন ভাবতেন। কখনো কখনো তাদের সঙ্গে খেলতে গেলেও হঠাৎ খেলার মধ্যে আনমনা হয়ে পড়তেন। খেলা ছেড়ে চলে আসতেন বাড়িতে। একা এবং নিরিবিলিতে থাকতেই যেন তাঁর বেশি ভালো লাগত।

বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। মায়ের কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি পাঁচ বছর বয়সেই কুরআনের আঠারো পারা মুখস্থ করে ফেলেন।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি মক্তবে ভর্তি হন। পড়াশোনায় তিনি ছিলেন খুবই মনোযোগী। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেক কিছু শিখে ফেলেন। অন্য ছাত্ররা সাতদিন যতটুকু পড়া আয়ত্ত করত তিনি দু-এক দিনেই তা আয়ত্ত করতেন। সম্পূর্ণ কুরআন শরিফ মুখস্থ করা ছাড়াও হাদিস শরিফ পাঠেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। অল্প বয়সেই ভালো মেধাবী ছাত্র হিসাবে তার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু মক্তবের বই পড়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, জীবন, জগৎ ও প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি যখন যে বিষয়ে পড়াশোনা করতেন, তা শেষ না করে ক্ষান্ত হতেন না। শিক্ষকদের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে জানবার আগ্রহ দেখাতেন। তাঁরা তাঁর এই অদম্য জ্ঞান পিপাসা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে অবাক হয়ে যেতেন। তাঁরা দুহাত তুলে তার জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতেন।

মক্তবের পড়া শেষ না হতেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তখন সংসারের সমস্ত ভার এসে পড়ে বালক আবদুল কাদিরের উপর। তাঁদের আর্থিক অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। তাই তাঁকে নিজ হাতে সংসারের অনেক কাজ করতে হতো। কিন্তু সংসারের নানা প্রকার চাপ তাঁর বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সময় মতো সংসারের কাজকর্ম শেষ করে আবার লেখা পড়ায় ডুবে যেতেন তিনি।

ছোটবেলা থেকেই ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি সযত্নে মেনে চলতেন। সেই বয়সেই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। সহপাঠী ও সম-বয়সীদের সঙ্গে তিনি কখনো কোনো বিষয়ে তর্ক ঝগড়া করতেন না। তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও সদাচারে সবাই মুগ্ধ ছিল। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত।

বাগদাদ ছিল তখন মুসলিম খলিফাদের রাজধানী। জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা ছিল তখনকার বিশ্বের সেরা জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের ছাত্ররা এখানে পড়াশোনার জন্যে এসে ভীড় জমাত। এখানকার শিক্ষকগণও ছিলেন খুবই জ্ঞানী ও গুণী। সে সময় বাগদাদে ছিল বহু আউলিয়া দরবেশের আস্তানা। তাঁরা সত্যের পথ দেখিয়ে গোমরাহ মানুষকে ধর্মের পথে নিয়ে আসতেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবার পথ দেখাতেন। হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) যখন গ্রামের মক্তবের পাঠ শেষ করলেন, তখন তার বয়স মাত্র সতেরো বছর। এবার নিয়ত করলেন তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান নিজামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হবার। এবিষয়ে অদম্য আগ্রহ জেগে উঠল তাঁর অন্তরে।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর বাগদাদে যাওয়া যায় না, বাধা অনেক। জিলান শহর থেকে বাগদাদের দূরত্ব চারশ মাইল। যাতায়াতের জন্য তখনকার দিনে তেমন কোনো যানবাহন ছিল না, পথ ছিল দুর্গম। তাছাড়া পথে ছিল ডাকাতের উৎপাত। তাই অনেক লোক দল বেঁধে যাতায়াত করত। হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) বাগদাদে যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় সমস্যা ছিল তার আর্থিক দুর্গতি। বিশেষ করে মা বৃন্ধ, বিদেশ চলে গেলে পিতৃহীন বালকের এই বৃন্ধ মাকে কে দেখবেন?

কিন্তু উপায় নেই শত বাধাবিপত্তি থাকলেও হযরত আবদুল কাদির (র.) কে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতেই হবে। বৃন্ধা মায়েরও একান্ত ইচ্ছা; ছেলে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হোক, বড় আলেম হোক। মানুষকে আলোর পথ দেখাক।

মা জানতেন, তাঁর ছেলের মধ্যে বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে। উচ্চ শিক্ষা না পেলে তার এই প্রতিভার বিকাশ ঘটবে না। তিনি তাই ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ যাওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং কাফেলার সন্ধান করতে বললেন।

আল্লাহ মেহেরবান, দেখতে দেখতে সুযোগ এসে গেল। হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) এক কাফেলার সন্ধান পেলেন। কাফেলার সবাই সওদাগর এবং তাঁরা জিলান শহর থেকে বাগদাদে যাবেন। এই কাফেলার কথা আবদুল কাদির জিলানি (র.) মাকে জানালেন। বৃন্ধা মা ছেলেকে বাগদাদ পাঠাবার জন্য সমস্ত আয়োজন করলেন। সেকালে ডাকের প্রচলন ছিল না। ইচ্ছা করলেই যখন তখন টাকা পাঠানো যেত না। মা অতি যত্নে জামার বগলের নিচে চল্লিশটি দিনার সেলাই করে দিলেন যাতে ডাকাতি বা চুরি না হয়। রওয়ানা দিলে বিদায়ের বেলা মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন- 'বাবা' বিদায় বেলা আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি, তা তুমি সব সময় মনে রাখবে। প্রথমত সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। দ্বিতীয়ত জান গেলেও কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। সত্যবাদিতা মুক্তি দান করে এবং মিথ্যা ধ্বংস করে- রাসুল (স.) এর এই হাদিসটি সব সময় স্মরণ রেখ। হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) মায়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে মিলিত হলেন কাফেলার সঙ্গে।

এ সম্পর্কে একটি গল্প আছে।

কাফেলা চলছে । হঠাৎ একদিন সে কাফেলার উপর হামলা হলো ডাকাতের। তারা কাফেলার বণিকদের সবকিছু কেড়ে নিল। তাঁরপর তাদের একজন এগিয়ে এলো ছেলেটির কাছে, জিজ্ঞেস করল, 'কী হে ছোকড়া, তোমার কাছে কিছু আছে কি?'

ছেলেটি নির্ভয়ে জবাব দিল– 'হ্যাঁ, আমার কাছে চল্লিশটি সোনার মোহর আছে।'

'কোথায়?'

'এই যে, জামার আস্তিনের নিচে সেলাই করা।'

ছেলেটির সহজ সরল জবাবে ডাকাতটি বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল নিতান্ত গরিব ছেঁড়া কাপড় এর কাছে কি করে এতগুলো সোনার মোহর থাকবে। ছেলেটি নিশ্চয় তার সাথে রসিকতা করছে।

কথাটা সে বলেও ফেলল, ‘তুমি কি আমার সাথে রসিকতা করছ?’

ছেলেটি বলল- ‘নাউজুবিল্লাহ! আপনার সাথে কি রসিকতা করা যায়? বিশ্বাস না হয় দেখুন’- এই বলে সে আস্তিনের সেলাই খুলে মোহরগুলো ডাকাতকে দেখাল।

ডাকাতটি এবার অবাক। সে তার পা থেকে মাথা অবধি কয়েকবার দেখে নিল। তারপর বলল- ‘দেখো বাপু, কাফেলায় ডাকাত পড়লে সবাই ভয়ে কাঁপতে থাকে। মালপত্র টাকাকড়ি লুকাবার চেষ্টা করে। আর তুমি কি না নির্ভয়ে বলে দিলে তোমার কাছে চল্লিশটি সোনার মোহর আছে। ডাকাতের কাছে সত্যি বলতে গেলে কেন? তুমি নিজে না বললে তো আমরা মোহরের কথা জানতেই পারতাম না।’

ছেলেটি বলল- আমার কাছে যে চল্লিশটি সোনার মোহর আছে, এটা তো সত্যি। আপনি না জানলেও যিনি সবকিছুই জানেন, সেই আলেমুল গায়েব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কিছুই অজানা নেই। মিথ্যে বলে আপনাকে আমি ধোঁকা দিতে পারি, কিন্তু আল্লাহকে তো আর ফাঁকি দিতে পারি না। তা ছাড়া, বাড়ি থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় আম্মা আমাকে বলে দিয়েছেন, হাজার বিপদে পড়লেও যেন মিথ্যা কথা না বলি। আম্মা আরও বলেছেন সত্যবাদিতা মুশকিল আসান করে। এখন বলুন তো তাঁর কথা অমান্য করে কিভাবে আপনাকে মিথ্যে কথা বলি?

ডাকাতটির তবু কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না। লুটতরাজ সেরে ছেলেটিকে নিয়ে গেল সরদারের কাছে।

সরদার ছেলেটির সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। শুনতে শুনতে নানান ভাবনার উদয় হলো তার মনে। কতই বা বয়স হবে ছেলেটার অথচ এর এত মনের জোর! আল্লাহর প্রতি এর কি অটল বিশ্বাস! মায়ের প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা। সত্যের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার! আর সে? সে নিজে কী করছে? জীবন ভর শুধু ডাকাতি। অসহায় পথিককে খুন জখম করে তাদের ধন কেড়ে নিয়েছে- এখনও নিচ্ছে।

এত সব ভাবতে ভাবতে, ডাকাত সরদার বিচলিত হয়ে পড়ল; আল্লাহ-ভক্ত মা-ভক্ত ছেলেটির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠে। তখনই সে তওবা করে ছেলেটির পায়ে পড়ে বলল- তুমি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছ। আজ থেকে এই পাপ কাজ ছেড়ে দিলাম। বাকি জীবন তোমার সঙ্গে থেকে তোমার সেবা করে কাটাব। বলা বাহুল্য, তাঁর সোহবতে থেকে এই ডাকাত একদিন আল্লাহর অলি হয়েছিলেন। এমনই সত্যবাদী বালক হলেন পরবর্তী কালের পীরানে পীর গাউসুল আজম হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.)।

১০৯৫ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি তাঁর স্বপ্নের দেশ বাগদাদে এসে হাজির হলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান এই সেই বাগদাদ। এখানে আসার জন্য তিনি আকুল হয়ে স্বপ্ন দেখতেন। সুদূর পথের বাধা, দুঃখ কষ্ট এমনকি মৃত্যুর ভয় তিনি উপেক্ষা করেছেন। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়, শুধু মাত্র জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি

এতো দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। আঠারো বছরের তরুণ আবদুল কাদির এসে ভর্তি হলেন এখানকার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান নিজামিয়া মাদরাসায়। মনের সমস্ত দরদ আর ভালোবাসা ঢেলে দিলেন জ্ঞান সাধনায়। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর অর্থ ফুরিয়ে গেল। একদিকে অদম্য জ্ঞান পিপাসা, অন্যদিকে অর্থের অভাবে বহুকষ্ট পেলেন তিনি। বহুদিন না খেয়েও কাটিয়েছেন। তবু তিনি তাঁর জ্ঞান পিপাসার উদগ্র বাসনাকে কোনো মতেই দমাতে পারলেন না। রাতদিন ক্ষুধার জ্বালা, অর্থের অভাব থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়ায় কিন্তু এতটুকু গাফলতি নেই তাঁর। তিনি ছিলেন অসীম ধৈর্য আর অটুট মনোবলের অধিকারী। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে নয়টি বছর কেটে গেল আবদুল কাদির (র.) এর। সকল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে তিনি ক্লাসে হাজির থেকেছেন। তিলে তিলে সংগ্রহ করেছেন জ্ঞানের উজ্জ্বল রত্ন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

হাদিস শাস্ত্রে সাফল্য লাভ করার পর তাঁকে যখন সনদ দেওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর শিক্ষক তাঁকে বলেছিলেন- 'আবদুল কাদির, হাদিস বিষয়ে আমরা আজ তোমাকে যে সনদ দিচ্ছি, এটা একটা প্রচলিত নিয়ম মাত্র। তোমার জ্ঞানের পরিধি এ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ হাদিসের অনেক ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ আমরা অনেক সময় তোমার সাথে আলোচনা করেই জানতে পেরেছি।' উচ্চ শিক্ষা লাভের পর হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) আত্মনিয়োগ করলেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। তাঁর এই পিপাসা মিটানোর জন্য লোভ-লালসা, রাগ-হিংসা প্রভৃতি মানুষের দুশমনকে চরমভাবে ত্যাগ করলেন এবং পীর আউলিয়া ও দরবেশদের সোহবতে কাটালেন অনেক দিন। তবুও মন থেকে লোভ-লালসা কিছুতেই দূর হতে চাইল না।

শেষে তিনি কঠোর সাধনায় মন দিলেন। লোকালয় থেকে দূরে জঙ্গালে নির্জন পরিবেশে চলে গেলেন। সমস্ত পার্থিব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে মুছে একমাত্র আল্লাহর জিকিরে দিন কাটাতে লাগলেন। আল্লাহর ধ্যানে বাধা সৃষ্টি হয় বলে তিনি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করলেন। ফলমূল খেয়ে সময় কাটাতেন। সারাক্ষণ

কুরআন তিলাওয়াতে, জিকিরে ডুবে থাকতেন। রাতের ঘুমকে পরিত্যাগ করে সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন।

এমনিভাবে কঠোর সাধনার ফলে হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) একজন কামেল অলিতে পরিণত হলেন। তিনি হয়ে উঠলেন যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ। যে কাজ মানুষের কাছে ছিল অতন্ত কঠিন, তা-ই হয়ে গেল তাঁর কাছে অতি সহজ। যে পথে মানুষ চলতে ভয় পায় সে পথে নির্ভয়ে চলতেন তিনি। লাভ করলেন আল্লাহর পিয়ারা বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য।

তারপর লোকালয়ে ফিরে এসে তিনি মানব জাতির মহান উপকার করে দেশের মানুষকে কুপথ, অত্যাচার ও অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে আনলেন আল্লাহর পথে। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়ে উঠল তাঁর ভক্ত। আল্লাহর

দুনিয়াতে তিনি অসাধ্য কাজকে সাধ্য করলেন। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, ইবাদতখানা তৈরি করলেন। মানুষের উপকারে সারা জীবন আত্মত্যাগ করে মানুষের মনের কোঠায় স্থান করে নিলেন চির জীবনের জন্য। নিজের কাজ নিজে করতেন, সহজ সরল জীবন যাপন করতেন বলেই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। তাঁর মায়ের স্বপ্ন সফল হলো। আল্লাহর মাহবুব বান্দা হয়ে তিনি দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সবাই তাঁকে তাজিম করে ডাকত 'বড়পীর' বলে। সত্যিই তিনি ছিলেন বড়পীর গাউসুল আজম।

হিজরি ৫৬১ সাল, ১১ই রবিউস সানি। এশার নামাযের সময় হলো। তিনি হুকুম করলেন, তাঁকে গোসল দেওয়ার জন্য। গোসলের পর তিনি এশার নামায আদায় করলেন। মুনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একানব্বই বছর।

(সংকলিত)

শব্দার্থ ও টীকা

সংস্পর্শে – সম্পর্ক, সঙ্গ।

মোহর – স্বর্ণমুদ্রা।

দৃষ্টান্তে – উদাহরণ, নজির।

প্রতিভা – স্বভাবজাত অসামান্য বুদ্ধি।

অরাজকতা – শাসনহীন।

দিনার – আরবের স্বর্ণমুদ্রা।

ক্ষান্ত – ক্ষমাশীল, নিবৃত, বিরত।

কাফেলা – তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারী দল।

স্বল্পভাষী – কম কথা বলে যে।

পাঠের উদ্দেশ্য

ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

পাঠ পরিচিতি

মানব কল্যাণে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় হযরত কাদির জিলানি (র.) তাঁদের অন্যতম। তাঁর বাল্য ও শিক্ষা জীবন অতি কষ্টের ছিল। তিনি মানুষের অজ্ঞতা দূর করে বিপথগামীকে পথে এনে আল্লাহর জগতের মহাকল্যাণ সাধন করেছেন। বাল্যকালে পিতৃহারা হয়ে শিক্ষার্থী জীবনের অতিকষ্টের পরেও কীভাবে লেখাপড়া করেছেন এবং একজন পরিপূর্ণ জ্ঞানী মানুষে পরিণত হয়েছেন এই বিষয়টি আলোচ্য পাঠে বর্ণিত হয়েছে।

২০২৩

কর্ম-অনুশীলন

১। ইতিহাস খ্যাত একজন মহৎ ব্যক্তির জীবনী নিয়ে দলে আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ লেখো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাগদাদের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বিশ্বের সেরা জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র?

ক. নিজামিয়া মাদরাসা খ. আলিয়া মাদরাসা

গ. জামেয়া ঘ. জামেয়া আল-আজহার

২. হযরত আবদুল কাদির এর নামের সঙ্গে 'জিলানি' সংযুক্ত হয় কীভাবে?

ক. আরবদের নামকরণের প্রথানুযায়ী খ. জিলানের বাসিন্দা বলে

গ. পিতামাতা নাম রাখার কারণে ঘ. বংশের নাম অনুযায়ী

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

হাসান রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মানিব্যাগ কুড়িয়ে পায়। কিছুক্ষণ পর মানিব্যাগের মালিক ব্যাগটি খুঁজতে খুঁজতে হাসানের কাছে চলে আসে এবং ব্যাগটি পেয়েছে কি না তা জিজ্ঞাস করে। হাসান সাথে সাথেই বলে উঠে, জি চাচা আমি এটি রাস্তায় পেয়েছি। লোকটি তখন হাসানকে মানিব্যাগ পাওয়ার বিষয়টি গোপন না করার কারণ জানতে চাইলে সে বলে, আমার বাবা আমাকে সবসময় সত্য কথা বলার উপদেশ দিয়েছেন।

৩. উদ্দীপকের হাসানের সাথে গল্পের কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আব্দুল কাদির জিলানি (র.) খ. ডাকাত সরদার

গ. কাফেলার সদস্য ঘ. জনৈক পথিক

৪. উদ্দীপকের বক্তব্যে গল্পের যে দিক ফুটে উঠেছে তা হলো-

i. সত্যবাদিতা
ii. উদারতা
iii. সত্যের প্রতি স্থির থাকা

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ গ্রামে সামান্য বিষয় নিয়ে দুটি গোত্রের বিবাদ ক্রমেই সংঘর্ষের রূপ নেয়। বাড়ি-ঘর ও ক্ষেতের ফসল ধ্বংস হয়। আব্দুল সামাদ সেই গ্রামের একজন কিশোর। সে এই সংঘর্ষে জড়িত না হলেও ঘটনা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মানুষের এই বিপর্যয়ে সে ব্যথিত ও চিন্তিত। সে সমবয়সী কয়েকজনকে নিয়ে একদিন গোপন স্থানে সমাবেশ করে এবং এই সমাবেশ থেকে বর্তমান পরিস্থিতির উত্তরণের জন্য কিছু কথা বলে ও অন্যদের মতামত চায়। সকলেই এই ব্যাপারে ভালো কিছু পরামর্শ দেয়।

ক. হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) এর জন্মস্থান কোথায়?

খ. ছোট বেলায় হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) এর স্বভাব কেমন ছিল?

গ. উদ্দীপকের আব্দুস সামাদের চিন্তাধারার সাথে হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) এর সাদৃশ্য কোথায়?

ঘ. উদ্দীপকটি হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) শীর্ষক রচনাটির মূল বক্তব্যকে ধারণ করেছে- এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। আব্দুল কাদির জিলানি (র.) এর বংশ পরিচয় সম্পর্কে লেখো।

২। ছোটবেলায় আবদুল কাদির জিলানি (র.) এর স্বভাব কেমন ছিল?

৩। আবদুল কাদির জিলানি বাগদাদ যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন কেন?

৪। আবদুল কাদির জিলানি (র.) কে বড় পীর বলা হয় কেন?

৫। আব্দুল কাদির জিলানি (র.) এর কথায় ডাকাত সরদারের মধ্যে কী পরিবর্তন দেখা গেল?

পিতৃপুরুষের গল্প

হারুন হাবীব

অন্তুর মামা বড়ো বেশি একটা ঢাকা শহরে আসেন না। ওর মা চিঠি লিখে কত বলেন, ‘কাজল তুই ঢাকা শহরে চলে আয়। আমার বাসাতেই থাকবি যদ্দিন চাকরি না হয়।’ কাজল মামা তবু আসে না। গ্রাম নাকি খুব ভালো লাগে কাজল মামার।

১৯৭১ সালে কাজল মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। পড়তে পড়তেই বেঁধে গেল যুদ্ধ। একদিন ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ সে গ্রামে এসে হাজির। তারপর রাতদিন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ছেলেদের জোগাড় করে মিছিল মিটিং। রাইফেল জোগাড় করে ট্রেনিং। আরও কত কি! অন্তুর নানা কত বকতেন, ‘বাবা, এসব করিস নে। বিপদে পড়বি।’

‘বাঘা বাঙালিরা এবার যুদ্ধ করবে, বাবা। স্বাধীনতা এবার আসবেই।’ সাহস নিয়ে বলত কাজল মামা।

সেই কাজল মামার যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্তু। বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকেই। মা ওকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে, ‘তুই এক কাজ কর অন্তু। চিঠি লেখ মামাকে। বল, এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যেন অবশ্যই ও ঢাকা আসে। আরও বল, তুই যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছিস। দেখবি ঠিক আসবে।’

বুদ্ধিটা অন্তুর মা’র হলেও এমন একটা কৌশল চিন্তা করত সে বেশ ক’দিন আগে থেকেই। কাউকে না জানিয়ে অন্তু চিঠি লিখেছে। সেও প্রায় দশ-বারো দিন হয়ে গেছে। আজ আঠারো তারিখ। তিন দিন বাদেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। ওর কেন যেন বিশ্বাস কাজল মামা আর কারও কথা শুনুক না শুনুক তার কথা রাখবেই, আসবেই সে ঢাকা।

অন্তু বরাবর রাত ন’টা-সাড়ে ন’টায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ রাতে সে দশটারও ওপরে জেগে থাকল। মা বললেন, ‘ঘুমাতে যাস নে কেন?’

অন্তু খুলে বলে না কিছু। এগারোটা বাজতেই কিন্তু ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ওর। লেপের নিচে ঢুকতে ঢুকতেই সে কী গভীর ঘুম!

ভোরবেলায় সে দেখল কাজল মামা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। লেপ থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে বসল সে বিছানায়।

মামা বললেন, ‘ভালো আছিস তুই অন্তু? শেষ রাতের ট্রেনে এলাম। এসে দেখি তুই ঘুমাচ্ছিস।’ অন্তু বলে, ‘আজ কিন্তু উনিশ তারিখ, তা তো জানো মামা। দু’দিন বাদেই একুশে ফেব্রুয়ারি।’

মামা বললেন, ‘ঠিক আছে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়েই বেরুব তোকে নিয়ে। যেখানেই যেতে চাস সেখানেই যাব। পাঁচদিন আমি ঢাকায় থাকব — এর মধ্যে চারদিনই তোর সাথে। যেখানে যেতে চাইবি যাব। যত গল্প শুনতে চাস শোনাব।’

মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোড থেকে একটি রিকশায় চাপল অন্তু আর কাজল মামা। লালমাটিয়া-ধানমণ্ডি হয়ে রিকশা চলছিল। মামা বললেন, ‘এই যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এর নাম সাতমসজিদ রোড। জানিস?’

‘কি যে বলো মামা! জানব না কেন?’

‘ঠিক আছে বল দেখি, সাতমসজিদ নাম হয়েছে কেন রাস্তাটার?’

‘তা তো ঠিক জানি না।’

‘এই জন্যই বলছিলাম, অতীতের অনেক জিনিসই জেনে রাখা ভালো আমাদের। অতীত মানে আমাদের আগের দিন। পুরোনো দিনের ওপরেই তো বর্তমানের দিন-রাত গড়ে ওঠে।’

কাজল মামা সংক্ষেপে বললেন। এই ঢাকা শহরের আগের নাম জাহাঙ্গীরনগর। মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের নামে। সেই সময় থেকেই শহরের আনাচে-কানাচে অনেক মসজিদ তৈরি হতে থাকে। এই রাস্তাটা পিলখানার মোড় থেকে মোহাম্মদপুর এসে সাতগম্বুজ মসজিদে ঠেকেছে। সেই পুরোনো মসজিদের নামেই রাস্তাটার নাম হয়েছে সাতমসজিদ রোড।

রিকশাটা নিউমার্কেট পেরিয়ে নীলক্ষেত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে ঢুকতেই অন্তু জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি নাকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে মামা?’

‘হ্যাঁ, পড়তাম একদিন। তুই জানলি কী করে?’

'মা বলছিল তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তে তখনই যুদ্ধে গিয়েছ।'

'অন্তু, যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ। যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায়, একদেশে আরেক দেশে, মানুষের লোভ লালসায়। যুদ্ধে শক্তি দেখায় একজন মানুষ — কষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার জন্য, একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবার জন্য, সব অন্যায়-অত্যাচার আর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য। একাত্তর সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম — সাধারণ যুদ্ধ নয়।'

দেখতে দেখতে রিকশাটা রোকেয়া হল আর শামসুন্নাহার হল পেরিয়ে জগন্নাথ হলের সামনে এসে পৌঁছাল। কাজল মামা বললেন, 'এই যে ডান পাশে বিল্ডিংটা দেখছিস, ওটার নাম কি জানিস?'

'না।'

'জগন্নাথ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা থাকে।'

'তুমি থাকতে এখানে?'

'না। আমি থাকতাম হাজী মুহাম্মদ মহসীন হলে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই হলের কয়েক শত ছাত্রকে ওই মাঠটাতে একসাথে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল।'

'কেন?'

'কারণ পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা আমাদের বাংলাদেশটাকে গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল। আর ছাত্ররা যেহেতু তরুণ এবং পাকিস্তানিদের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত, সেহেতু ওদের গুলির শিকার হলো ওরাই প্রথম।'

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে এসে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন কাজল মামা। দু'দিন বাদেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। মামা বললেন, 'অন্তু, এই পৃথিবীতে অসংখ্য-অগণিত জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। ওদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীন হয়েছেন তাঁদের সেই স্বাধীনতা লাভের পেছনে প্রচুর ত্যাগ-তিতিক্ষা আছে। অনেক রক্তের ইতিহাস আছে। হাজারো লক্ষ প্রাণদানের করুণ কাহিনি আছে। আর সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।'

অন্তু মামাকে বলে, 'মামা, এবার কি তুমি ফুল দিতে আসবে শহিদ মিনারে?'

'আসব। গ্রামে থাকি, অনেক বছর আসতে পারি নি। এবার তোকে নিয়েই আসব। বলতো অন্তু, শহিদ মিনার বাঙালির স্মৃতিসৌধ কেন?'

'মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে গিয়ে এখানে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল একদিন।'

অন্তুর স্পষ্ট উত্তরে কাজল মামা খুব খুশি হলেন। বললেন, 'তুই তো বেশ কিছু জানিস অন্তু। তোর উত্তরে খুব খুশি হয়েছি আমি। এই শহিদ মিনার হলো আমাদের ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির মিনার। পাকিস্তানের শাসকেরা আমাদের বাঙালিদের ওপর তাদের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা মেনে নেয় নি। তাই ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঠিক এই জায়গাটায় যখন তাঁরা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল তখনই পাকিস্তানি পুলিশ গুলি করে অনেককে হত্যা করেছে।

২০২৩

চাপ চাপ রক্তে এই জায়গার মাটি ভিজে গেছে। ওই রক্তের বিনিময়েই আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।'

অন্তুর মুখ দেখে কাজল মামা বুঝলেন সে মন খারাপ করেছে। মানুষ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে এ ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না অন্তু। মামাকে বলে, 'মামা, তুমিও তখন এখানে ছিলে?'

'নারে পাগল। আমি তো তখন তোর মতোই ছোটো। এখানে যাঁরা বাহান্ন সালে রক্ত দিয়েছেন তাঁরা সবাই আমার বড়ো। ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ — ওদের আমরা চিরদিন মনে রাখব — শ্রদ্ধা করব।'

কাজল মামার হাত ধরে অন্তু একের পর এক সিঁড়ি ডিঙিয়ে শহিদ মিনারের ওপরে ওঠে। মামার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারির কাহিনি শুনে সে আগ্রহী হয় নিজ জাতির অতীত সংগ্রামের আরও কাহিনি শুনতে। কেউ তো আগে এমন করে বলে নি তাকে। অথচ কত কাহিনি আছে বাঙালি জাতির। অন্তু বলে, 'তুমি আমাকে আরও কাহিনি বলো মামা।'

'একুশে ফেব্রুয়ারির দিন যখন ফুল দিতে আসবি, সেদিন আরও বলব। আজ শুধু এটুকুই বলি — এই একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা হচ্ছে আমাদের জাতির প্রথম শহিদ। ওরা রক্ত দিয়েছিল বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছিল। শুধু তা-ই নয় একুশে ফেব্রুয়ারি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতার মূল সংগ্রাম শুরু হয়। সেই সংগ্রাম আরও উনিশ বছর ধরে চলে। এই উনিশ বছরে অসংখ্য মানুষ মারা যায়, অনেক মায়ের কোল খালি হয়ে যায়। তারপর আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।'

'সেই মুক্তিযুদ্ধে তুমি ছিলে?'

২০২১

'হ্যাঁ, আমি ছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধে।'

'বলতে হবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গল্প। বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খেয়েই বলবে। ঠিক তো?'

'ঠিক।'

শহিদ মিনার থেকে নেমে কাজল মামা আর অন্তু জুতো পরে নেয়। ফিরে আসার সময় মামা বলেন, 'অন্তু চল, আমরা দু'জনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই।'

অন্তু ও কাজল মামা নীরবে শ্রদ্ধা জানায়।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শব্দার্থ ও টীকা

হানাদার বাহিনী	—	অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী বাহিনী। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বোঝাচ্ছে। এই বাহিনী বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।
তিতিক্ষা	—	সহনশীলতা।
সামরিক শাসন	—	সামরিক বাহিনী দ্বারা যখন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনকে সামরিক শাসন বলা হয়।
পিতৃপুরুষ	—	পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ, জাতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

পাঠ-পরিচিতি

'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটির কিশোর অন্তু ঢাকায় বসবাস করে। মায়ের কাছে মুক্তিযোদ্ধা কাজল মামার সাহসী সংগ্রামের গল্প শুনে অন্তুর মনে মামার মুখ থেকে যুদ্ধের গল্প শোনার আগ্রহ জাগে। সে মামার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। একুশে ফেব্রুয়ারির দুদিন আগে কাজল মামা ঢাকায় আসেন। মামার কাছেই শুরু হয় অন্তুর অতীত সম্পর্কে তথ্যনির্ভর ইতিহাসের পাঠ। অন্তু জানতে পারে ঢাকা শহরের নামের ইতিহাস, সাতমসজিদ রাস্তার নামের ইতিহাস। জানতে পারে যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পার্থক্য; পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ও ছাত্রদের প্রতিবাদী ভূমিকার কথা। ঢাকা শহরে রিকশায় ঘুরতে ঘুরতে কিশোর অন্তু স্মৃতিসৌধ, ভাষা আন্দোলন, শহিদ মিনারসহ বাঙালি জাতির পিতৃপুরুষ কারা, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

লেখক-পরিচিতি

কথাসাহিত্যিক হারুন হাবীব একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা এবং ৭১-এর রণাঙ্গন সংবাদদাতা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হলো: *প্রিয়যোদ্ধা*, *ছোটগল্প–সমগ্র* ১৯৭১, *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, *Blood and Brutality* ইত্যাদি। তাঁর জন্ম ১৯৪৮ সালে জামালপুরে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ভাষা-শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে আমাদের কী কী করা উচিত – ১০টি বাক্যে তা লেখো।

খ. তোমার গ্রাম/মহল্লার যেকোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার সংক্ষিপ্ত জীবনী কমপক্ষে ১৫টি বাক্যে লেখো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোগল আমলে ঢাকার নাম ছিল

ক. বাবরনগর　খ. হুমায়ুননগর

গ. আকবরনগর　ঘ. জাহাঙ্গীরনগর

২. অন্তুর নানা কাজলকে বকতেন কেন?

ক. ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকায়

খ. গ্রামে চলে যাওয়াতে

গ. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে

ঘ. চাকরি হয়নি বলে

নিচের উদ্দীপক পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

(১) "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"। আমি কি ভুলিতে পারি?

(২) "মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।"

৩. উদ্দীপকের প্রথম অংশটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

i. ভাষা আন্দোলন

ii. মুক্তিযুদ্ধ

iii. ইতিহাস-ঐতিহ্য

কোনটি সঠিক?

ক. i　খ. ii

গ. i ও ii　ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের মূলভাব নিচের কোন কথাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. স্বাধীনতা এবার আসবেই

খ. যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ

গ. অনেক রক্তের ইতিহাস আছে

ঘ. ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রিয়তি বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাবা-মা ওকে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। বাবা-মায়ের সাথে সেও ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। বাবার কাছে ভাষা-শহিদদের আত্মত্যাগের কথা শুনে গর্বে মনটা ভরে ওঠে প্রিয়তির। কিন্তু শহিদ মিনার থেকে ফেরার পথে দুটি শিশু ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে ফুটপাতে পড়ে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, দেখে মন খারাপ হয় প্রিয়তির।

ক. ১৯৭১ সালে কাজল মামা কোথায় পড়তো?

খ. 'যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ' – উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকের প্রিয়তির মন খারাপ হওয়ার বিষয়টি 'পিতৃ পুরুষের গল্প' এর কোন দিক নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "ভাষা-শহিদদের প্রতি প্রিয়তির মনোভাব 'পিতৃ পুরুষের গল্প' এর মূল চেতনাকেই প্রতিফলিত করেছে।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১। অন্তুর মামা মিটিং মিছিল করত কেন?

২। কাজল মামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রামে এসে কী করলেন?

৩। কাজল মামা অন্তুকে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

৪। যুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পাথর্ক্য কী? ব্যাখ্যা করো।

ছবির রং
হাশেম খান

ছবি আঁকতে ইচ্ছে হচ্ছে?

কাগজ তো সাদা। পেনসিলে আঁকা যায়। হাতের কলমটা দিয়েও আঁকা যায় এই সাদা জমিনে।

রং হলে খুউব ভালো হয়। ইচ্ছেমতো লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি, হলুদ, কালো রং ঘষে ঘষে সাদা কাগজটা ভরে ফেলা যায়। সুন্দর এক রঙিন ছবি আঁকা হয়ে যায়।

হলুদ, নীল ও লাল এই তিনটিই কিন্তু আসল রং। এই তিন রং থাকলে নানা রঙে ভরা পরিপূর্ণ রঙিন ছবি আঁকা যায়। এই তিনটি রং মিলিয়ে মিশিয়ে অনেক রং পাওয়া যায়। যেমন —

হলুদ ও নীল মেশালে পাবে সবুজ।

নীল ও লাল মেশালে পাবে বেগুনি।

লাল ও হলুদ মেশালে পাবে কমলা।

এভাবে একটির সঙ্গে আরেকটি রং বা একাধিক রং মিশিয়ে কত রকম রং যে পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটি রং ছাড়া সবগুলো সঠিক নামে চেনা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে — লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটিই হলো মৌলিক রং বা প্রাথমিক রং। সবুজ, কমলা ও বেগুনি হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের বা মাধ্যমিক রং এবং অন্যান্য রং পরবর্তী পর্যায়ের। সাদা ও কালো রং ছবি আঁকার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক রং মিলিয়ে মিশিয়ে এই দুটো রং পাওয়া যাবে না। তবে সবুজ ও লাল ঘন করে মিশিয়ে কালোর কাছাকাছি গাঢ় একটি রং তৈরি করা সম্ভব।

রংধনুর সাতটি রং। বৃষ্টির পর আকাশে যখন রংধনু ফুটে ওঠে, একটি একটি করে গুণে সাতটি রং খুঁজে বের করা যায়। হলুদ, কমলা, লাল, সবুজ, নীল, বেগুনি ও আসমানি।

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। বছরের ১২ মাসকে আমরা ২ মাস করে প্রকৃতি ও আবহাওয়ার কারণে ভাগ করে নিয়েছি।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই ২ মাস গ্রীষ্মকাল। আবহাওয়া থাকে শুষ্ক ও গরম। বৃষ্টি হয় কম। গাছপালা, খাল-বিল-নদী শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড রোদে গাছের সবুজ-সতেজ রং বিবর্ণ হয়ে যায়। আবার হঠাৎ করে আকাশে কালো রঙের মেঘের ছুটাছুটি, বিদ্যুৎ চমকানো, সঙ্গে কানে তালালাগা প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয়। তারপর ঝড় ও বৃষ্টি। প্রকৃতিতে রঙের নানা রকম খেলা চলে। রং-বেরঙের ফল — আম, জাম, কলা, লিচু, তরমুজ এই গ্রীষ্ম ঋতুতে পাওয়া যায়। লাল, নীল, কালো, হলুদ, গোলাপি, কমলা সবুজ রঙের এই বাহারি ফলগুলোর স্বাদও মিষ্টি।

বর্ষাকাল হলো আষাঢ়-শ্রাবণ মাস। ঝিরঝিরে অল্প বৃষ্টি থেকে ঝর ঝর করে প্রবল বেগে বৃষ্টি হয় এ সময়। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, ঝিল-বিল পানিতে টইটুম্বুর। পানি পেয়ে গাছপালা সতেজ হয়ে যায় — নানা রকম সবুজ রঙে ভরে যায় গাছপালা, বন-জঙ্গল, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত ইত্যাদি। সাদা ও কমলা রঙের কদম ফুল বর্ষা ঋতুর ফুল। এই ঋতুতে সতেজ ও সবুজ কচুবনে যখন কমলা রঙের লম্বা লম্বা ফুল ফোটে, চমৎকার লাগে দেখতে। কচুফুল তরকারি হিসেবেও সুস্বাদু।

শরৎকাল — সাদা ও স্বচ্ছ নীলের ছড়াছড়ি। ভাদ্র ও আশ্বিন — এই দুই মাস শরৎকাল। এ সময়ে বৃষ্টি বসে যায়। সুন্দর নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ ভেসে বেড়ায়। গাছপালা নদীনালা প্রকৃতির সবকিছু এই ঋতুতে ঝকঝকে। নদীর ধারে ও বিলে অল্প পানিতে কাদামাটিতে সবুজ গাছ থেকে বের হয়ে আসে নরম সাদা কাশফুল। বাতাসের দোলায় এই কাশফুল যখন দোলে, সুন্দর নরম রঙের কারণে মন তখন আনন্দে নেচে ওঠে। বিলে, পুকুরে এ সময় শাপলাফুল ফোটে। বেশির ভাগ শাপলা সাদা, লাল শাপলাও আছে — যা দেখতে খুবই সুন্দর। ভরা নদী ও খালে সাদা, লাল, নীল ও হলুদ বিভিন্ন রঙের পালতোলা নৌকা-চলাচলের দৃশ্য মোহনীয়।

হেমন্ত ঋতু হলো কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস। সবুজ ধানক্ষেতের রং হলুদ হতে শুরু করে। ঋতুর শেষ দিকে — অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে পুরো মাঠে হলুদ বা গেরুয়া রঙের বাহার। ধান পেকে গেছে। চাষিরা দল বেঁধে ফসল কাটা শুরু করে।

এরপরেই পৌষ ও মাঘ মাস — শীতকাল। বনে-জঙ্গলে, বাড়ির আঙিনায় সর্বত্রই নানা রঙের ফুল ফোটা শুরু হয়। এই ফুল ফোটা শীতের পরে বসন্ত ঋতু পর্যন্ত চলতে থাকে। শিমুল, পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া গাছে যখন ফুল ফোটে, হলদে গাছের ঝলমলে হলুদ রঙের ফুলে পুরো প্রকৃতি যেন রঙের উৎসবে মেতে ওঠে। মাঠে তিলের ক্ষেতে সাদা ও হালকা বেগুনি ফুল এবং সরষের ক্ষেতে ফুলে ফুলে হলুদের বন্যা নামে এই ২০২৩

শীতকালেই। শীতের কারণে মানুষের পোশাকে আসে রঙের বৈচিত্র্য। লাল, নীল, হলুদ, কালো বিচিত্র রঙের গরম কাপড় ও টুপি ব্যবহার করে মানুষ।

শীতকালে কুয়াশাও প্রকৃতিতে ধোঁয়াটে ধরনের এক মায়াবী রং আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। খুবই ঠান্ডা ও বরফ-পড়া দেশ থেকে চলে আসে আমাদের দেশে লক্ষ পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে এরা আশ্রয় নেয় আমাদের দেশের খালে-বিলে-নদীতে — যাদের বলা হয় অতিথি পাখি। রং-বেরঙের পালক এসব পাখির। শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে এরা আবার চলে যায় নিজের দেশে।

ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্তকাল। ষড়ঋতুর শেষ ঋতু। এ সময় গাছে গাছে যেন প্রতিযোগিতা — কে কত সুন্দর ও সতেজ ফুল ফোটাতে পারে। নানা রঙের পালকে সেজে ছোটবড় সব পাখি গাছে গাছে নেচে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়। ফুলের মধু খেয়ে উড়ে বেড়ায় আনন্দে। অন্যদিকে হাজার লক্ষ রঙিন প্রজাপতি। এত রং-বেরঙের যে হিসেব করা সম্ভব নয়। নানা রঙের মোহময় প্রেরণায় মানুষও স্বভাবসুলভ আনন্দে মেতে ওঠে। বাসন্তী ও উজ্জ্বল রঙের পোশাকে, সাজসজ্জায় উৎসবে মেতে ওঠে। তাই বসন্ত ঋতুই হলো রঙের ঋতু।

অনেক কাল আগে থেকেই — বাংলাদেশের ষড়ঋতুতে আমাদের পরিবেশে, নিসর্গে উজ্জ্বল-সুন্দর নানা রঙের যে সমাবেশ ঘটেছে — রূপের রকমফের ঘটে চলেছে — তা বাঙালির মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই আমরা দেখি আমাদের গ্রামীণ সমাজের লোকশিল্পীরা মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, কাপড় ও তুলার পুতুল, সোনার পুতুল, লক্ষ্মীসরা, শখের হাঁড়ি, নকশিকাঁথা, হাতপাখা, পাটি, গল্প বলার পটে তথা লোকশিল্পে উজ্জ্বল ও সতেজ রং ব্যবহার করে ছবি ও শিল্পকে সুন্দর ও মোহনীয় রূপ দিয়ে চলেছে।

তাঁতে তৈরি কাপড়ে তাঁতিরা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের তৈরি তাঁতের পোশাকে রঙিন সুতোর বুনটে নানা রঙের ঝলমলে মনকাড়া সব শাড়ি ও পোশাক বানিয়ে চলেছে। আমাদের শিশুরা এখন ছবি আঁকে। বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিশুদের ছবির রং অনেক উজ্জ্বল, সাহসী এবং মৌলিক রং ঘেঁষা। তাই খুব সহজেই বাংলার শিশুদের ছবিকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে চেনা যায়।

চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পীদের ছবির সামনে দাঁড়ালে একই কথা মনে হবে। বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক মুক্ত, সহজ ও সাহসী। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, কালো ও সাদা রংকে শিল্পীরা সুন্দরভাবে ছবিতে, নকশিকাঁথায়, হাতপাখায়, পুতুলে, হাঁড়িপাতিলে ব্যবহার করছেন। তাই বাংলার শিল্পীদের শিল্পকর্ম সারা বিশ্বে প্রশংসা পাচ্ছে।

শব্দার্থ ও টীকা

খুউব	–	খুব। জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে খুউব।
মৌলিক রং	–	যার মধ্যে অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ ঘটেনি। একটি মাত্র রঙে গঠিত।
ষড়	–	ছয়।
প্রচণ্ড	–	কড়া, কঠোর।
গেরুয়া	–	মাটির মতো রং।

বাহার	–	শোভা, সৌন্দর্য।
সর্বত্র	–	সব জায়গায়।

পাঠের উদ্দেশ্য

ঋতুভেদে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

আমরা চারপাশে গাছ-লতাপাতা, ফুল, মাঠ, নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দেখি। তাদের রূপ আছে। রং আছে। সেই রূপকে নানান রঙে নিজের মতো যাঁরা আঁকেন তাঁদের আমরা বলি চিত্রশিল্পী। বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের চারপাশের পরিবেশের রূপ ও রং বদলে যায়। চিত্রশিল্পীরাও তাঁদের ছবিতে রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তোলেন। ছবির সেই নানান রং ও রঙের বৈচিত্র্যের কথাই লেখক হাশেম খান তাঁর 'ছবির রং' লেখাটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক-পরিচিতি

শিল্পী হাশেম খান ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিত্রকলা বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চাও করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *ছবি আঁকা ছবি লেখা*, *জয়নুল গল্প*, *গুলিবিদ্ধ ৭১*।

কর্ম-অনুশীলন

ক. প্রকৃতিনির্ভর ছড়া, কবিতা বা গল্প লিখে দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশ (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।

খ. প্রকৃতিনির্ভর ছবি এঁকে প্রদর্শনীর আয়োজন (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।

গ. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ছবি আঁকার মৌলিক রংগুলো কী?

ক. হলুদ, সবুজ ও বেগুনি   খ. লাল, হলুদ ও কমলা

গ. লাল, নীল ও হলুদ   ঘ. হলুদ, নীল ও সবুজ

২. মাঠে গেরুয়া বাহার দেখে বোঝা যায়-

i. অগ্রহায়ণ মাস চলছে

ii. মাঠে ধান পেকেছে

iii. মানুষের পোশাকে বৈচিত্র্য এসেছে

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বোনের সাথে বেড়াতে যায় সবিতা। সেখানে তার বোন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখায়। হঠাৎ সবিতার চোখ ক্যাম্পাস-সংলগ্ন বিলে আটকে যায়। সেখানে রংবেরঙের হাজার হাজার পাখির মেলা বসেছে। কিন্তু কোনো পাখিই তার পরিচিত নয়।

৩. উদ্দীপকের অচেনা পাখিগুলো ছবির রং রচনায় কোন ঋতুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?

ক. বর্ষাকাল খ. শরৎকাল
গ. শীতকাল ঘ. বসন্তকাল

৪. উদ্দীপকের পাখিগুলোকে আমাদের দেশে কী বলে?

ক. মায়াবী পাখি খ. রংবেরঙের পাখি
গ. বসন্তের পাখি ঘ. অতিথি পাখি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রিংকু তার মামার বাড়ি আলোকদিয়ায় বেড়াতে যায়। তার মা তাকে সেখানকার বিদ্যালয়ে নিয়ে যান। বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে নানা রঙের অনেক ফুল আর প্রজাপতি দেখে সে মুগ্ধ হয়। ওদের কুহু কুহু আওয়াজ তাকে পুলকিত করে। বেড়াতে আসা লোকগুলো যেন সেই সুরে মাতোয়ারা। সেখানে সে শিক্ষার্থীদের তৈরি উজ্জ্বল রঙের নানা ধরনের পুতুল, বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। ছবিগুলো এত জীবন্ত যে, মনেই হয় না সেগুলো শিশুদের আঁকা। বিচিত্র ছবিগুলো আমাদের জীবন ও প্রকৃতির চিত্র মূর্ত করে তুলেছে।

ক. চাষিরা কোন মাসে দল বেঁধে ফসল কাটে?
খ. ‘এই তিনটি রং মিলিয়ে মিশিয়ে অনেক রং পাওয়া যায়।’– ব্যাখ্যা কর।
গ. বিদ্যালয়ের দৃশ্যে ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের কোন ঋতুর পরিচয় পাওয়া যায়?– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. “উদ্দীপকটি ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের আংশিক ভাব প্রকাশ করছে।”– বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। বাংলাদেশকে ষড়ঋতুর দেশ বলা হয় কেন?
২। মৌলিক রং কয়টি ও কী কী?
৩। রংধনুর কয়টি রং এবং কী কী?
৪। বসন্ত ঋতুকে রঙের ঋতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

সেই ছেলেটি

মামুনুর রশীদ

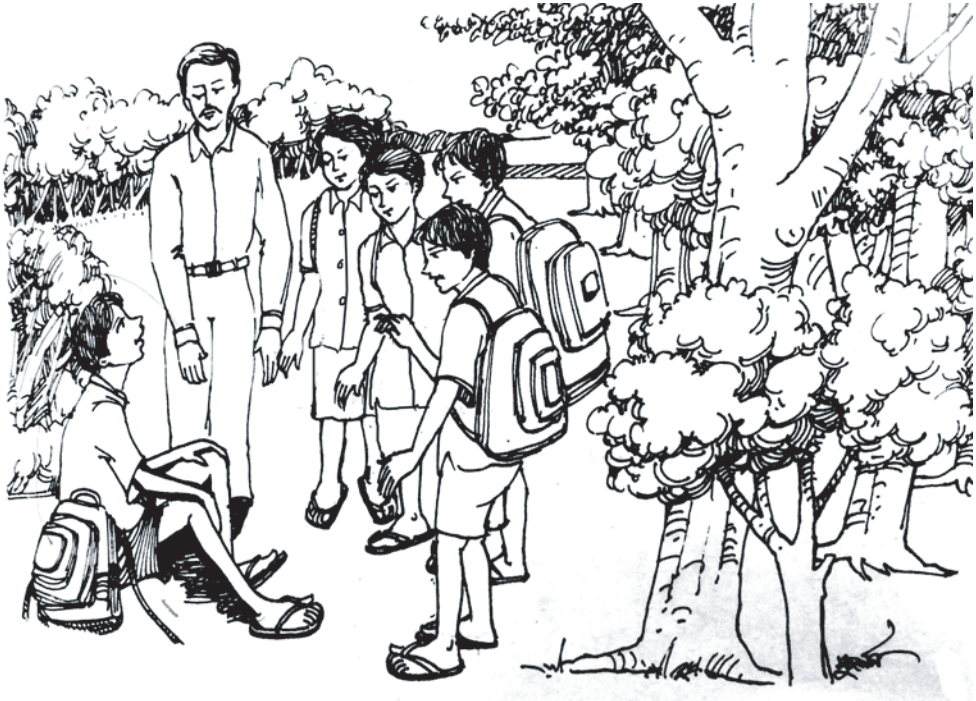

১ম দৃশ্য

(গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সোমেন, সাবু ও আরজু। সবাই গান গাইতে গাইতে স্কুলে যাচ্ছে। বেশ তাড়া তাদের। একসময় হঠাৎ থেমে যায় আরজু। ওরা আরজুকে ফেলেই চলে যায়। আরজুর ব্যথা পায়ে। সাবু ফিরে আসে।)

সাবু	–	কী হলো আবার?
আরজু	–	আমি যে আর হাঁটতে পারছি না।
সাবু	–	রোজ রোজ তোর জন্য আমি স্যারের বকুনি খেতে পারব না।
আরজু	–	ঠিক আছে তোরা যা, আমি একাই এক্ষুনি যাব।
সাবু	–	থাক তাহলে।
		(চলে যায় সাবু। আরজু বসে পড়ে। এ সময়ই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক আইসক্রিমওয়ালা।)
আইসক্রিমওয়ালা	–	আইসক্রিম, আইসক্রিম চাই আইসক্রিম। কী হলো আরজু মিয়া, তুমি এখানে বসে কী করছ?
আরজু	–	কিছু না।
আইসক্রিমওয়ালা	–	স্কুলে যাবে না?
আরজু	–	না।

আইসক্রিমওয়ালা – স্কুলে ফাঁকি দেওয়া কিন্তু খুব খারাপ, আমিও খুব স্কুল ফাঁকি দিতাম। আমার অবস্থা দ্যাখো। যদি লেখাপড়াটা করতাম তাহলে কি আর আইসক্রিম ফেরি করতে হতো? যাও স্কুলে যাও। চাই আইসক্রিম, আইসক্রিম।

আরজু – ভাই শোনো— তুমি কোন দিকে যাচ্ছ?

আইসক্রিমওয়ালা – আমি তো যাব ঐ বাজারের দিকে।

আরজু – আজ স্কুলের দিকে যাবে না? আইসক্রিম খাব, টিফিন পিরিয়ডের সময়।

আইসক্রিমওয়ালা – ক্লাস যখন চলে তখন তো আর আইসক্রিম বিক্রি হয় না। আমার বাজারের সময় চলে যায়। চাই আইসক্রিম। (আইসক্রিমওয়ালা চলে যায়। হাওয়াই মিঠাইওয়ালার প্রবেশ।)

আরজু – ভাই শোনো।

হাওয়াই মিঠাইওয়ালা – শুধু শুধু ডাকছ কেন? এভাবে সময় নষ্ট হলে আমার হাওয়াই মিঠাই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

আরজু – তোমার হাওয়াই মিঠাই কি মেঘের মতো যে, মেঘ জমছে আর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হাওয়াই মিঠাওয়ালা – হ্যাঁ, মেঘের চাইতেও অনেক হালকা — তাই তো মিলিয়ে যায়। যাই — চাই হাওয়াই মিঠাই (চলে যায়)।

আরজু – এখন আমি কী করব? বাড়ি গেলে বাবা বলবে স্কুলে ফাঁকি দেওয়ার মতলব — স্কুলে গেলে স্যার বলবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। এখন কী হবে?

২য় দৃশ্য

(টিফিনের ঘণ্টা বাজে। সোমেন, সাবু ও আরও ছেলেমেয়ে টিফিন পিরিয়ডে বেরিয়ে আসছে। তারা খেলছে। এ সময়ে আসেন লতিফ স্যার।)

লতিফ স্যার – এই সাবু, এদিকে শোনো— আচ্ছা আরজুকে দেখছি না যে?

সাবু – স্যার মাঝপথে এসে আরজু বলল তোরা যা। এরকম মাঝে মাঝেই করে আরজু।

লতিফ স্যার – কিন্তু কেন করে?

সাবু – এমনিই।

লতিফ স্যার – এমনিই মানে? ইচ্ছে করে? না কি কোনো সমস্যা আছে ওর?

সাবু – জানি না স্যার।

লতিফ স্যার – আচ্ছা। এই যে সোমেন, এদিকে শোনো, তোমার কী মনে হয় আরজু কি ইচ্ছে করেই স্কুল কামাই করছে?

সোমেন – স্যার, ওর যে কী হয়? হঠাৎ করে বলে আমি আর যেতে পারছি না, তোরা দাঁড়া। তখন ওয়ার্নিংবেল বেজে গেছে। আর কি দাঁড়াতে পারি? তাই তো চলে আসি, সেটাই ভালো না স্যার?

লতিফ স্যার – কোথায় যেন একটা সমস্যা মনে হচ্ছে।

মিঠু – স্যার ঐ ছেলেটার সাথে আমারও দেখা হয়েছে।
লতিফ স্যার – কোথায়?
মিঠু – ঐ যে পলাশতলীর আমবাগানের ওখানে বসে আছে। আমার সাথে নানান কথা।
লতিফ স্যার – নানা কথা? তাহলে স্কুলে এলো না কেন?
মিঠু – একসময় বলল তুমি কি স্কুলের দিকে যাবে? আমি বললাম না — এখন বাজারে যাব। তারপর টিফিন পিরিয়ডের দিকে স্কুলের দিকে যাব।
লতিফ স্যার – তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা। আচ্ছা ঐ আমবাগানে কি এখনও আছে?
সোমেন – মনে হয় এতক্ষণে বাড়ি চলে গেছে।
লতিফ স্যার – তোমরা চলো তো —
সাবু – স্যার (ওদের চোখে মুখে অনিচ্ছা। হাওয়াই মিঠাইওয়ালা হেঁকে চলছে–হাওয়াই মিঠাই। লতিফ স্যার ওদের দুইজনকে নিয়েই রওয়ানা দেন।)

৩য় দৃশ্য

(আমবাগান। অসহায় আরজু বসে আছে। একা সে উঠে দাঁড়ায়। একটা পাখি ডাকছে। তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে সে।)

আরজু – পাখি, একটু নিচে নাম না। তোমার সাথে কথা কই। আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবে? সাবু, সোমেন ওরা কেউ নিয়ে গেল না। তুমি নিয়ে যাও না! তোমার ডানায় ভর করে চলে যাব। কী হলো? নেমে গেলে কেন? মেঘ আমায় নিয়ে যাও না। তোমার কোলে বসে চলে যাব স্কুলে। কী বলছ? ভিজে যাব? ভিজলাম। আবার শুকিয়ে যাব — তবুও তো স্যার বুঝবেন, ছোটো পাখি চন্দনা, এই যে শালিক আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি একলা বসে আছি। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমার সাথে কথা বল না — চন্দনা আমায় নিল না, মেঘ আমায় নিল না — শালিক আমার সাথে কথা বলে না।

(আরজু কাঁদতে থাকে। হঠাৎ উপস্থিত হয় লতিফ স্যার।)

লতিফ স্যার – আরজু, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে? তুমি স্কুলে যাও নি কেন?
সোমেন – কাঁদিস কেন? স্যারকে বল না। (আরজু কাঁদছেই)
লতিফ স্যার – কোনো ভয় নেই, বল।
আরজু – স্যার, আমি বেশি দূর হাঁটতে পারি না। পা দুটো অবশ হয়ে আসে।
লতিফ স্যার – তোমার বাবা-মাকে বল নি কেন?
আরজু – বলেছি — বাবা বলেন হাঁটাহাঁটি করলেই ঠিক হয়ে যাবে।
লতিফ স্যার – তোমার পা দুটো দেখি — এ তো রোগ, তোমার পা চিকন হয়ে গেছে।
আরজু – মা জানে, সেই ছোটোবেলায় কী যেন অসুখ হয়েছিল সেই থেকেই পাটা চিকন — মা বোঝে কিন্তু কাঁদে শুধু।
লতিফ স্যার – তোমরা খেয়াল কর নি?
সোমেন – না স্যার।

লতিফ স্যার – তোমাদের বন্ধু না?
সোমেন – জ্বী স্যার।
লতিফ স্যার – তোমার যদি এরকম হতো?
সোমেন – আমরা বুঝতে পারিনি স্যার। এরকম বুঝলে আমরা দুজনে ধরে এইভাবে নিয়ে যেতাম। (দুজনেই কাঁধে হাত দিয়ে ওকে তুলে ফেলে।)
লতিফ স্যার – বলো স্কুলে যাবে? না কি বাড়ি যাবে?
আরজু – স্কুলে স্যার। (ওদের কাঁধে হাত তুলে আরজু স্কুলে যায়।)
লতিফ স্যার – চলো। দেখি তোমার চিকিৎসার জন্য আমরা কী করতে পারি।

শব্দার্থ ও টীকা

সেই ছেলেটি – 'সেই ছেলেটি' নামক এই লেখাটি একটি নাটিকা। এটি এ বইয়ের আর সব লেখার মতো নয়। এতে কয়েকজন বিশেষ বিশেষ জায়গায় থেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এ ধরনের রচনা কেবল পড়ার জন্য নয়। এগুলো মঞ্চে অভিনয় করে লোককে দেখানো হয়। এ ধরনের লেখা আকারে বড়ো হলে তাকে বলে নাটক।

দৃশ্য – নাটক বা নাটিকায় বিষয়গুলোকে ঘটনাস্থল অনুসারে ভাগ করে নেওয়া হয়। এক-একটি ঘটনাস্থলকে 'দৃশ্য' বলা হয়। 'সেই ছেলেটি' নাটিকার তিনটি ঘটনাস্থলকে তিনটি দৃশ্যে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। ১ম দৃশ্য — গ্রামের পাশের রাস্তা। ২য় দৃশ্য — সাবু, আরজুদের স্কুল। ৩য় দৃশ্য — আমবাগান।

মতলব – উদ্দেশ্য বা ফন্দি।

পাঠের উদ্দেশ্য

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত) শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি।

পাঠ-পরিচিতি

নাট্যকার মামুনুর রশীদ রচিত 'সেই ছেলেটি' একটি নাটিকা। নাটিকাটিতে একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত) শিশুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে শিশুর প্রতি বড়োদের মমত্ববোধ। আরজু, সোমেন ও সাবু তিন বন্ধু একই স্কুলে একই শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ে হেঁটে আসতে আরজুর খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তার পা অবশ হয়ে আসে। বন্ধুদের সাথে সমান তালে চলতে পারে না। কখনো কখনো বসে পড়ে। বন্ধুরা আরজুর জন্যে আস্তে আস্তে হাঁটে। তাতে স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যায় এবং ওরা শিক্ষকের কাছে বকুনি খায়। আরজু ছোটোবেলায় ভীষণ অসুখে পড়েছিল। তাতে তার পা সরু হয়ে যায়। কিন্তু আরজু জানে না, কেন তার পা অবশ হয়ে আসে। তার মা জানেন আরজুর অসুখের কথা। তিনি কাঁদেন।

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে পা অবশ হয়ে গেলে আরজু বন্ধুদের স্কুলে চলে যেতে বলে। সে রাস্তার পাশে বসে থাকে। আইসক্রিমওয়ালা আসে, হাওয়াই মিঠাইওয়ালা আসে। সে তাদের সাথে কথা বলে। তারা চলে যায়। আরজু ভাবে পাখি কিংবা মেঘ তাকে যদি উড়িয়ে নিয়ে স্কুলে দিয়ে যেত!

এদিকে শিক্ষক লতিফ স্যার আরজুকে ক্লাসে না দেখে সোমেনদের কাছ থেকে ঘটনাটি জেনে সোমেনদের সঙ্গে নিয়ে আরজুর খোঁজে রওয়ানা হন। আরজুকে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে, আরজুর পা অবশ হয়ে আসা একটা রোগ। তখন লতিফ স্যারের কথায় সোমেনদের মনে সহানুভূতি জাগে। তাদের সহায়তায় আরজু স্কুলে যায়।

লেখক-পরিচিতি

মামুনুর রশীদ বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক। তিনি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হলো : 'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'গিনিপিগ' ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার তৈরি করে র‍্যালির আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

২. নাটিকাটি অভিনয় করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সেই ছেলেটি নাটিকায় দৃশ্য সংখ্যা কয়টি?

ক. দুইটি খ. তিনটি

গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

২. আরজু তার বন্ধুদের সাথে স্কুলে যেতে যেতে বসে পড়ে কেন?

ক. সে স্কুলে যেতে চায় না খ. স্যার তাকে বকুনি দিতে পারে

গ. তার স্কুল ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল ঘ. রোগের কারণে সে হাঁটতে পারে না

৩. 'মা বোঝে কিন্তু কাঁদে' কারণ –

ক. ছেলের পা চিকন হয়ে যাচ্ছে

খ. ছেলের পা একদিন পঙ্গু হয়ে যেতে পারে

গ. ছেলের পায়ের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না

ঘ. ছেলের এই অবস্থায় তিনি অসহায়

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

রেবেকা কাছের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু দূরের জিনিস ঝাপসা দেখে। একদিন সে লক্ষ করল দূরের ঝাপসা জিনিস অর্ধেক দেখা যাচ্ছে আর অর্ধেক পুরো অন্ধকার। মাকে জানালে তিনি বললেন চোখে পানি দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

২০২৩

৪. উদ্দীপকের রেবেকার সাথে 'সেই ছেলেটি' নাটিকার আরজুর সাদৃশ্য আছে–

ক. আর্থিক অবস্থায় খ. পুষ্টিহীতায়

গ. প্রতিবন্ধকতায় ঘ. বুদ্ধিহীনতায়

৫. 'সেই ছেলেটি' নাটিকা অনুযায়ী রেবেকার প্রয়োজন–

i. মাতা পিতার সহানুভূতি

ii. সমাজের সহানুভূতি

iii. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবিদ স্যার ৭ম শ্রেণির ছাত্র রওশনের কাছে তার স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে সে কিছু না বলে চুপ থাকে। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তারা প্রায় একযোগে বলে — স্যার, রওশন প্রায়ই স্কুল কামাই করে। শিক্ষক রওশনকে বলেন–আর কামাই করবে? কোনো উত্তর দেয় না রওশন। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মেঝে খুঁড়তে থাকে। উত্তর না পেয়ে শিক্ষক রওশনকে অনেক বকা দেন। কয়েকদিন পর রওশনের বাবা আবিদ স্যারকে বলেন–স্যার, রওশনের স্নায়ু রোগ আছে। নিয়মিত স্কুল করলে ওর অসুখটা বেড়ে যায়। বকাঝকা করলে ওর স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

ক. মিঠু আরজুকে কোথায় বসে থাকতে দেখেছে?
খ. আইসক্রিমওয়ালা আরজুকে স্কুল ফাঁকি দিতে নিষেধ করল কেন? –বুঝিয়ে লেখো।
গ. রওশন ও আরজুর মধ্যকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. আবিদ স্যারের বিচার কাজটি লতিফ স্যারের তুলনায় কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে? –তা মূল্যায়ন করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১। আরজু স্কুলে যায়নি কেন?

২। আইসক্রিমওয়ালা আরজুকে কী বলেছিল?

৩। হাওয়াই মিঠাইওয়ালা আরজুর ডাকে সাড়া দেয়নি কেন?

৪। আরজুর বন্ধুরা আরজুকে রেখে স্কুলে চলে গেল কেন?

বহু জাতিসত্তার দেশ–বাংলাদেশ

এ. কে. শেরাম

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির একটি দেশ। এখানে প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি রয়েছে প্রায় অর্ধশত জাতিসত্তার মানুষ। দেশের প্রধান ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার পাশাপাশি রয়েছে অনেক ভাষা এবং ঐসব জাতিগোষ্ঠীর নানা বর্ণের বিচিত্র সংস্কৃতিও। তারপরও আমরা সবাই জাতীয়তার পরিচয়ে এক এবং দেশকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ। বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই যে একতার শক্তি, এটিই আমাদের বাংলাদেশকে সুন্দর ও বর্ণময় করে তুলেছে।

বাঙালি ছাড়া বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য জাতিসত্তার সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে এই সংখ্যা ৪৬টি বলে অনুমিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদ ছাড়াও দেশের সমতলভূমি যেমন কক্সবাজার, পটুয়াখালি, বরগুনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর ও সিলেট অঞ্চলে প্রধানত এদের বসতি। এইসব জনগোষ্ঠী শত শত বছর ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুবই প্রিয়।

বাংলাদেশে যেসব সংখ্যাস্বল্প জাতিসত্তার বাস তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরি, খাসি, ম্রো, রাখাইন, হাজং, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, কোচ, পাহাড়িয়া, রাজবংশী, মালো, ওঁরাও ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

চাকমা

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত চাকমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। নিজেদের মধ্যে তারা 'চাঙমা' নামে পরিচিত। তারা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিজস্ব হরফও আছে। চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। চাকমা সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। গ্রামের যাবতীয় সমস্যা তিনিই নিষ্পত্তি করেন। চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তার পাশাপাশি এখনও তারা কিছু কিছু প্রকৃতিপূজাও করে থাকে। চাকমা পুরুষেরা 'ধুতি' ও মহিলারা 'পিনন' পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তাঁতে তৈরি 'সিলুম' (জামা) পরে। মেয়েরা 'খাদি'কে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস ও শাক-সবজি। চাকমা-জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন লৌকিক আচার অনুষ্ঠান থাকে। বিয়ের সময় ছেলের অভিভাবককে ঘটকসহ কনের বাড়িতে কমপক্ষে তিনবার যাওয়া-আসা করতে হয়। প্রতিবার চুয়ানি, পান-সুপারি ও পিঠা নিয়ে যেতে হয়। বিজু উৎসব চাকমাদের একটি প্রধান উৎসব। চৈত্রের শেষ দুইদিন 'ফুলবিজু' ও 'মূলবিজু' এবং পহেলা বৈশাখকে 'গর্য্যাপর্য্যা' বলে আখ্যায়িত করে থাকে তারা। লোকনৃত্যগীত হিসেবে 'জুমনাচ' ও 'বিজুনাচ' বেশ জনপ্রিয়।

গারো

গারো জনগোষ্ঠীর প্রধান বসতি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও সিলেট অঞ্চলে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত গারোরা মাতৃসূত্রীয়। মেয়েরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। বিবাহের পর বর স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বসবাস করে থাকে। সন্তান-সন্ততিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। তবে পরিবার, সমাজ পরিচালনা ও শাসনে পুরুষেরাই দায়িত্ব পালন করে থাকে। একই গোত্রে বিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ। গারোদের নিজস্ব ধর্ম আছে। এটি এক ধরনের প্রকৃতি-পূজা। গারোরা প্রধানত কৃষিজীবী। পাহাড়ে বসবাসকারীরা জুম চাষ করে। আর সমতলভূমির গারোরা নারী ও পুরুষ একসাথে সাধারণ নিয়মে কৃষিকাজ করে। গারোরা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অলঙ্কারও ব্যবহার করে থাকে। গারো সংস্কৃতিতে গীতবাদ্য ও নৃত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্রও আছে। ফসল বোনা, নবান্ন, নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়। 'ওয়ানগালা' গারোদের একটি জনপ্রিয় উৎসব।

মারমা

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত মারমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে। মারমা ভাষাও মঙ্গোলীয় ভাষা পরিবারের। তাদের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। মারমারা প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বিয়ের সময় ধর্মীয় ও লোকাচার মিলিয়ে নানা অনুষ্ঠান পালন করে। নিজেদের গোত্রে বিবাহকে মারমা সমাজে উৎসাহিত করা হয়। মারমারা পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়েদের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। তবে পরিবার ও সমাজজীবনে পুরুষেরই প্রাধান্য থাকে। বিয়ের পর নারী-পুরুষ ইচ্ছে করলে মা-বাবার বাড়ি কিংবা শ্বশুরবাড়িতে স্থায়িভাবে বসবাস করতে পারে। মারমাদের সামাজিক শাসনব্যবস্থায় রাজা প্রধান। মারমারা জুম চাষ করে এবং বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও মারমা জনগোষ্ঠী এখনও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং নানা আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব হলো নববর্ষে সাংগ্রাই দেবীর পূজা এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংগ্রাই উৎসব তিন দিন ধরে চলে।

মণিপুরি

মণিপুরিদের আদি নিবাস ভারতের মণিপুর রাজ্য। এদের মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। মণিপুরিরা যেখানেই বসতি স্থাপন করে সেখানে কয়েকটি পরিবার মিলে গড়ে তোলে পাড়া। প্রতিটি পাড়াতেই থাকে দেবমন্দির ও মণ্ডপ। ঐ মন্দির ও মণ্ডপকে ঘিরেই আবর্তিত হয় ঐ পাড়ার যাবতীয় ধর্মীয়

ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। মণিপুরি সমাজে পাড়া বা গ্রাম ও 'পানচায়' বা পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নৃত্যরত মণিপুরি

মণিপুরি জনগোষ্ঠী সাতটি গোত্রে বিভক্ত। মণিপুরিদের প্রাচীন ধর্মের নাম 'আপোকপা'। তবে মণিপুরিদের অধিকাংশই এখন সনাতন ধর্মের চৈতন্যমতের অনুসারী। মণিপুরিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সনাতন ধর্মাবলম্বী মণিপুরিদের প্রধান উৎসব রাস উৎসব, রথযাত্রা ইত্যাদি। রাস উৎসব উপলক্ষ্যে রাসনৃত্য ও মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মণিপুরিরা প্রধানত কৃষিজীবী। ভাত, মাছ, শাক-সবজি মণিপুরিদের প্রধান খাদ্য। মণিপুরি পুরুষেরা সাধারণত ধুতি, গামছা, জামা ইত্যাদি পরিধান করে। আর মেয়েরা পরে নিজেদের তৈরি বিশেষ ধরনের পোশাক।

ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রামগড়, রাঙামাটি, কাপ্তাই এবং চট্টগ্রাম জেলা, বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালি ও সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় মহাজাতির অংশ। তাদের ভাষার নাম 'ককবরক'। এদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। ত্রিপুরা সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। ছেলেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ত্রিপুরারা বর্তমানে সাধারণভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তারা এখনও তাদের প্রাচীন লোকজ ধর্মের নানা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি করে।

ত্রিপুরা মেয়েরা কাপড় বয়নে খুবই দক্ষ। তারা নিজেদের পরনের কাপড় নিজেরাই তাঁতে তৈরি করে। পুরুষেরা পরিধান করে নিজেদের তৈরি গামছা ও ধুতি। ত্রিপুরারা কৃষিজীবী। তারা পাহাড়ে জুম চাষ করে। ত্রিপুরাদের সংগীত ও নৃত্য খুবই সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সংগীতের প্রচলন যেমন আছে, তেমনি আছে নানা

২০১৭

প্রকারের নৃত্যও। ত্রিপুরাদের প্রধান উৎসব নববর্ষ বা বৈসু। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ‘বৈসু’, মারমাদের ‘সাংগ্রাই’ ও চাকমাদের ‘বিজু’ উৎসবের প্রথম অক্ষর নিয়ে ‘বৈসাবি’ উৎসব এখন নববর্ষ উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় উৎসব।

সাঁওতাল

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লোক প্রধানত উত্তরবঙ্গ ও সিলেটের চা বাগানে বসবাস করে। তাদের ভাষা অস্ট্রিক পরিবারের। সাঁওতাল সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির মালিকানায় এবং সমাজ ও পরিবারে পুরুষই প্রধান। সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম আছে। কিন্তু কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। পেশার দিক থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত — কৃষক ও শ্রমিক। অনেকের জন্যে কৃষি যেমন প্রধান জীবিকা তেমনি অনেকে আবার শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে থাকে। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সাঁওতালদের সংগ্রামী ভূমিকা, বিশেষ করে ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ ও ‘নাচোল কৃষক বিদ্রোহ’ ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

সাঁওতাল নৃত্য

সাঁওতালরা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। বাড়িঘর লেপে মুছে পরিষ্কার রাখা হয় এবং দেয়ালে নানা রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয়। ‘সোহরাই’ হচ্ছে সাঁওতাল সমাজের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এটা অনেকটা পৌষ-পার্বণের মতো। সাঁওতাল নৃত্যে মেয়ে-পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে নাচে। তাদের ঝুমুর নাচ খুবই জনপ্রিয়।

বাংলাদেশের এইসব ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার জীবন ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে — বর্ণিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও রয়েছে তাদের বিরাট অবদান। তারা আজ জাতীয় মূলধারারই অংশ।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

সংখ্যাস্বল্প জাতিসত্তা — বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ হচ্ছে বাঙালি। বাঙালি ছাড়া আরও কিছু জনগোষ্ঠী বা জাতি আছে, যারা ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতির দিক থেকে বাঙালিদের মতো নয়। তাদের সংখ্যা বাঙালিদের তুলনায় কম। যেমন : চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, হাজং, ত্রিপুরা ইত্যাদি।

সংস্কৃতি — ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় পাওয়া যায় এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সংস্কৃতি। বাঙালির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর দ্বারা বাঙালিকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায়। তেমনি ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সংস্কৃতিও আলাদা আলাদা। তবে নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশের সকলেই এক ও অভিন্ন।

আর্যভাষা — দুনিয়ার একটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী। তার একটি শাখার নাম আর্য ভাষা। এই আর্য ভাষা থেকে বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, চাকমা প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার — মানব সমাজে দু'রকমের পরিবার প্রথার সৃষ্টি হয়েছে; (ক) পিতৃতান্ত্রিক, (খ) মাতৃতান্ত্রিক। পরিবারের প্রধান নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পত্তি যদি পুরুষের হাতে থাকে তাহলে সেরকমের পরিবারকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। আর যে পরিবার প্রথায় উক্ত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা নারীর হাতে থাকে, তাকে বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক। বাঙালিদের মতো চাকমাদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। তবে একালে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রভাব পড়েছে।

খাদি — হাতে কাটা (মেশিনে নয়) সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়।

লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান — স্থান ও জাতি বিশেষের ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান যার মধ্যে বর্তমান নাগরিক রুচির প্রভাব পড়ে নি, তাকে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়।

মাতৃসূত্রীয় পরিবার — কিছু সমাজ আছে যেখানে পুরুষগণ সমাজ পরিচালনা ও শাসনের অধিকারী হলেও নারীদের পরিচয়েই পরিবার পরিচিত হয়। এ ধরনের পরিবারকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। যেমন– গারো পরিবার।

পদবি — উপাধি, যা নামের শেষে যোগ করে বংশ পরিচয় দেওয়া হয়। পদবি বলতে কর্মক্ষেত্রে স্তর বা মর্যাদাও বোঝায়।

জুম — পাহাড়ে চাষাবাদের বিশেষ পদ্ধতি।

মঙ্গোলীয় ভাষাগোষ্ঠী — একটি ভাষাগোষ্ঠী; এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি ভাষার আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে।

মণ্ডপ — পূজা বা সভা-সমিতির জন্য ছাদযুক্ত চত্বর।

বয়ন — বোনা। কাপড় বোনার কাজ বা প্রক্রিয়া।

২০২১

পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশে মূল জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি জাতি। বাঙালি ছাড়াও এদেশে আরও অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে আছে চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।

এই জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনাচার। তাদের মধ্য থেকে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা ও সাঁওতালদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনাচার আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে, করেছে বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশে মণিপুরি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ কবি ও প্রাবন্ধিক এ. কে. শেরাম। তাঁর জন্ম ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে হবিগঞ্জে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : *বসন্ত কুন্নি পালগী লৈরাং*, *মণিপুরি কবিতা*, *চৈতন্যে অধিবাস*, *মনিদীপ্ত মণিপুরি ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক* ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকার বিভিন্ন লোকজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে একটি রচনা লেখো (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উৎসব কোনটি?

ক. সাংগ্রাই খ. বিজু
গ. বৈসু ঘ. সোহরাই

২. বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতিসত্তা জাতীয় মূলধারারই অংশ কারণ, তারা—

i. আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে
ii. জাতীয় সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
iii. ধর্মীয় দিক থেকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. iii ও i ঘ. i, ii ও iii

২০২৩

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাবার চাকরির সুবাদে সুমি সিলেটের একটি স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে লুসি দাড়িং নামে একটি মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কথা প্রসঙ্গে সুমি জানতে পারে 'দাড়িং' লুসির মায়ের পদবি। শুনে তার কাছে অদ্ভুত লাগে যে বিয়ের পর লুসির বাড়িতেই তার বর চলে আসবে।

৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের জাতিসত্তা সম্পর্কিত এই রচনায় কোন জাতিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়?

ক. চাকমা খ. মারমা
গ. গারো ঘ. সাঁওতাল

৪. উদ্দীপকের জাতিসত্তা আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তারা আমাদের—

i. সংস্কৃতির ধারক
ii. অবিচ্ছেদ্য অংশ
iii. ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাহার তার বন্ধু সঞ্জীবের সাথে পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে সে জানতে পারে স্থানীয় লোকজন সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, পিতৃতান্ত্রিক। তারা দেব-দেবীর পূজা করে এবং নববর্ষ এলে সাংগ্রাই উৎসব পালন করে। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তারা অন্যত্র বেড়াতে যায়। সেখানকার সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। সেখানে পুরুষেরা ধুতি ও মহিলারা 'পিনন' পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তৈরি 'সিলুম' পরে। মেয়েরা খাদিকে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

ক. চাকমারা পহেলা বৈশাখকে কী বলে আখ্যায়িত করে?

খ. পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. উদ্দীপকের প্রথম স্থানটি এই রচনার কোন জাতিসত্তাকে নির্দেশ করে? — ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "বাহার ও তার বন্ধু শেষে যেখানে বেড়াতে গেল তা বাংলাদেশের একটি জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে।"—উদ্দীপক ও রচনার আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। চাকমাদের পারিবারিক নিয়মনীতিগুলো উল্লেখ করো।

২। বিজু উৎসবের পরিচয় দাও।

৩। ত্রিপুরা জাতিসত্তার সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় দাও।

৪। চাকমাদের পোশাকের বিবরণ দাও।

নতুন দেশ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই, দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।
আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে
মাঝনদীতে নৌকো, কোথায়
চলে ভাঁটার টানে।
জানি না কোন দেশে
পৌঁছে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে।

থাকি ঘরের কোণে,
সাধ জাগে মোর মনে,
অমনি করে যাই ভেসে, ভাই,
নতুন নগর বনে।
দূর সাগরের পারে,
জলের ধারে ধারে,
নারিকেলের বনগুলি সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।
পাহাড়-চূড়া সাজে
নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না-যে।
কোন সে বনের তলে
নতুন ফুলে ফলে
নতুন নতুন পশু কত
বেড়ায় দলে দলে।

কত রাতের শেষে
নৌকো যে যায় ভেসে।
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে?

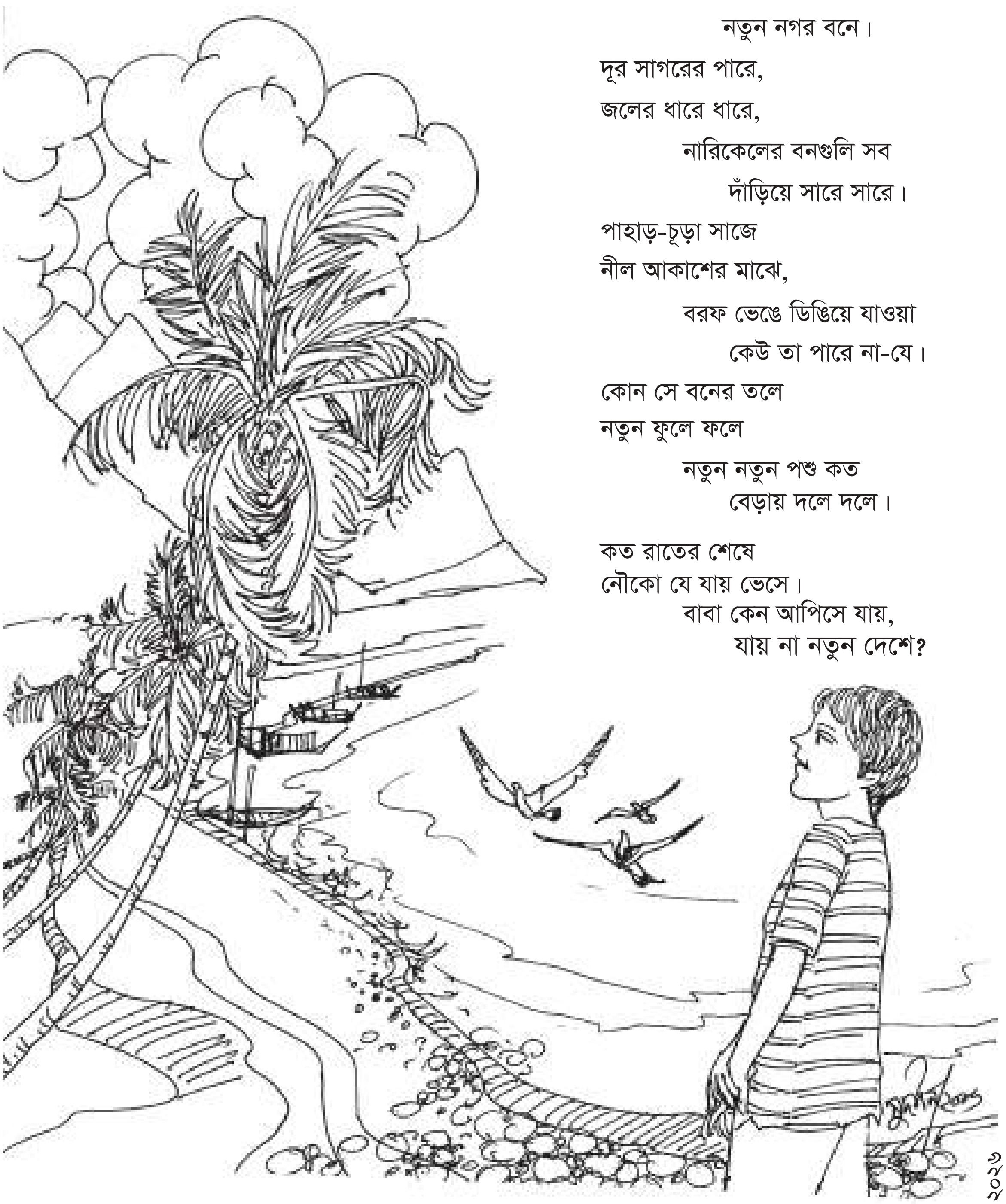

শব্দার্থ ও টীকা

ভাঁটা — চাঁদ ও সূর্যের শক্তির আকর্ষণে সমুদ্র বা নদীতে পানি বেড়ে যায়। একে বলে জোয়ার। এ পানি কমে যাওয়াকে বলা হয় ভাঁটা।

আপিস — অফিস শব্দের একটি কথ্য রূপ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সহজ পাঠ* গ্রন্থের প্রথম ভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কবিতায় অজানাকে জানার সীমাহীন কৌতূহল এবং প্রকৃতির সকল রহস্য উন্মোচন করার অপার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছে। ভাঁটার টানে ঘাটে বাঁধা নৌকা মাঝ নদী পেরিয়ে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তার কোনো ঠিক নেই। হয়তো কোনো নতুন দেশে বা নতুন পরিবেশে গিয়ে সে পৌঁছবে। এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে কৌতূহল জাগবে যে কারোরই। হয়তো কোনো অসীম সৌন্দর্য, অজানা আনন্দ বা অপার বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অজানার প্রতি এই ব্যাকুলতা শিশুরা তাদের আশপাশের সবার মধ্যেও দেখতে চায়।

কবি-পরিচিতি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে 'বিশ্বকবি' অভিধায় অভিহিত হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)। তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর চতুর্দশতম সন্তান।

আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় নতুন যুগের প্রবর্তক তিনি। পনেরো বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বনফুল*। *গীতাঞ্জলি* এবং তাঁর আরও কিছু কবিতার স্ব-অনূদিত কাব্যগ্রন্থ *Song offerings*-এর জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। *মানসী*, *সোনার তরী*, *চিত্রা*, *ক্ষণিকা*, *বলাকা* তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ছোটদের জন্য রচনা করেছেন *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *খাপছাড়া* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।

বাংলা ছোটগল্প প্রথম তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কবিতা, ছোটগল্প ছাড়াও উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত, ভ্রমণকাহিনি– বাংলা সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ ও চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তক, শিক্ষা-সংগঠক, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক, অভিনেতা, অনবদ্য চিত্রশিল্পী। এছাড়া তিনি 'শান্তিনিকেতন' ও 'বিশ্বভারতী'র মতো নতুন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার কল্পনার দেশের একটি বর্ণনা প্রস্তুত করো।

খ. তোমার এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।

গ. সর্বশেষ তুমি যে অঞ্চলে ভ্রমণ করেছ তার বর্ণনা লেখো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জলের ধারে কী দাঁড়িয়ে আছে?

ক. নতুন নগর   খ. পাহাড় চূড়া

গ. নারিকেল বন   ঘ. নতুন পশু

২. “অমনি করে যাই ভেসে, ভাই / নতুন নগর বনে।”
–এখানে কী প্রকাশ পেয়েছে ?

i. অসীম সৌন্দর্য

ii. অজানা আনন্দ

iii. অপার বিস্ময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. ii ও iii

গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘নতুন দেশ’ কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. সীমাহীন কৌতূহল

খ. প্রকৃতির রহস্য

গ. অজানাকে জানা

ঘ. অপার আকাঙ্ক্ষা

৪. উক্ত দিকটি ‘নতুন দেশ’ কবিতার কোন অংশে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. জানি না কোন দেশে / পৌঁছে যাবে শেষে

খ. থাকি ঘরের কোণে / সাধ জাগে মোর মনে

গ. পাহাড়-চূড়া সাজে / নীল আকাশের মাঝে

ঘ. দূর সাগরের পারে / জলের ধারে ধারে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শীতের ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে হৃদিতা বেড়াতে যায় সেন্টমার্টিন দ্বীপে। সেখানকার সামুদ্রিক প্রবাল, সারি সারি নারিকেল গাছ, মাছ ধরার বড়ো বড়ো নৌকা ওর মনে কৌতূহল জাগায়। দিগন্ত বিস্তৃত নীলাভ জলরাশি, পরিষ্কার আকাশ ওকে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। ওর ইচ্ছে হয় সমুদ্রের নানা রঙের মাছের সঙ্গে খেলা করতে – আবার কখনো বা আকাশে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে।

ক. 'নতুন দেশ' কবিতায় নীল আকাশের মাঝে কী সাজে?

খ. 'থাকি ঘরের কোণে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. হৃদিতার সেন্টমার্টিনে দেখা দৃশ্যে 'নতুন দেশ' কবিতায় চিত্রিত কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? –ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উদ্দীপকটি যেন 'নতুন দেশ' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে আছে।"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। নদীর ঘাটে গিয়ে কবি কী দেখলেন?

২। পাহাড়-চূড়া কীভাবে সাজে?

৩। কবির মনে কীসের সাধ জাগে? ব্যাখ্যা করো।

৪। ভাঁটা কী? ব্যাখ্যা করো।

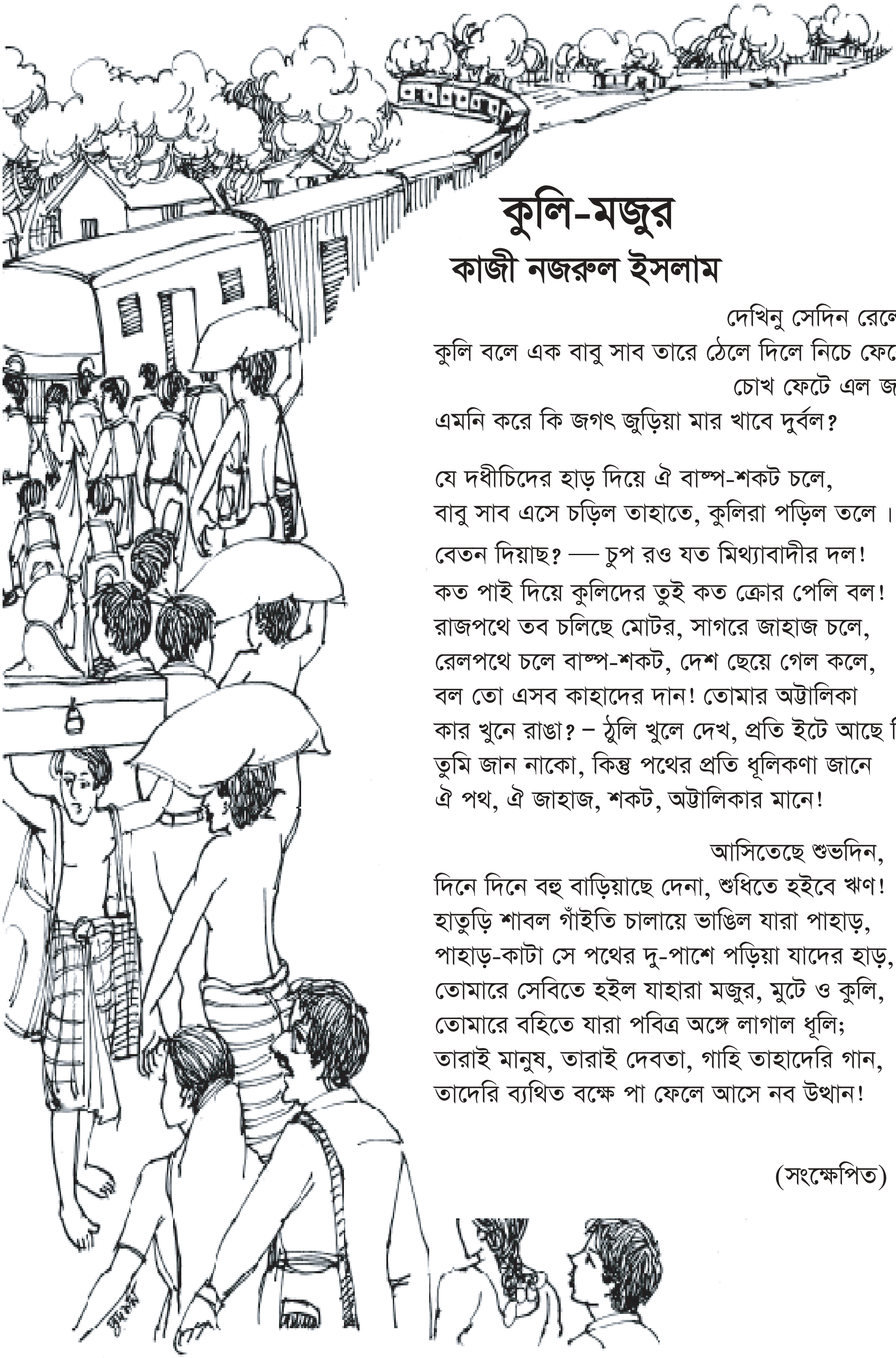

কুলি-মজুর

কাজী নজরুল ইসলাম

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সাব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ? — চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল!
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল তো এসব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? – ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাকো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে!

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

দধীচি – ভারতীয় পুরাণে উল্লেখিত একজন ত্যাগী মুনি। এ কবিতায় শ্রমজীবী কুলি-মজুরদের দধীচিমুনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে শ্রমজীবী মানুষেরা সভ্যতার বিস্তারে শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন তারাই আজ অবহেলিত। তাদের শ্রমের ওপর ভর করে যারা ধনী হয়েছেন, তারাই সকল সুবিধাভোগী। কবি দুঃখ করে ত্যাগী দধীচির সঙ্গে ত্যাগী কুলি-মজুরের তুলনা করেছেন।

বাষ্প-শকট – 'শকট' মানে গাড়ি। বাষ্প-শকট হচ্ছে বাষ্প দ্বারা চালিত গাড়ি। এখানে রেলগাড়ি।

পাই – আগের দিনের মুদ্রার ক্ষুদ্র একক বিশেষ। এ কবিতায় 'পাই' বলতে কুলি-মজুরদের মজুরির 'স্বল্পতা' বোঝানো হয়েছে।

ক্রোর – কোটি।

ঠুলি – চোখের ওপরের ঢাকনি। গরুকে যখন ঘানিতে জোড়া হতো, তখন তার চোখে ঢাকনি পরানো হতো। ঐ ঢাকনির নাম 'ঠুলি'। 'ঠুলি খুলে' মানে সচেতন হয়ে।

অট্টালিকা – প্রাসাদ, অন্য কথায় সুউচ্চ দালান বা ইমারত।

'দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা' – অতীতকাল থেকে মানব সভ্যতা শ্রমজীবী মানুষদের অবদানে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে তাঁরা পেয়েছেন অল্পই।

শাবল – লোহার তৈরি মাটি খোঁড়ার হাতিয়ার।

গাঁইতি – পাথর, ইট প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত কঠিন স্থান খোঁড়ার জন্য লাঙ্গলের আকারের দুমুখো কুড়াল।

বক্ষে – বুকে।

নব উত্থান – কোনো ভালো কাজের জন্য নতুন করে উদ্যোগী হওয়া।

পাঠের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি মানবসভ্যতার যথার্থ রূপকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে কলম ধরেছেন।

যুগ যুগ ধরে কুলি-মজুরের মতো লক্ষকোটি শ্রমজীবী মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। এদেরই অক্লান্ত শ্রমে ও ঘামে মোটর, জাহাজ, রেলগাড়ি চলছে। গড়ে উঠেছে দালানকোঠা, কলকারখানা। এদের শোষণ করেই ধনিকশ্রেণি হয়েছে বিত্ত-সম্পদের মালিক। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমাজে এই কুলি-মজুররাই সবচেয়ে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। এক শ্রেণির হৃদয়হীন স্বার্থান্ধ মানুষ এদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বিত্ত-সম্পদের সবটুকুই ভোগ করছে, অথচ এদের তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করতেও নারাজ।

২০২৩

কবি-পরিচিতি

অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা লিখে বাংলার জনমনে যিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে নন্দিত আসন পেয়েছেন, তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম ।

বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে গান করেছেন, রুটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, যুদ্ধে যোগ দিয়ে সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়েছেন। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে লেখালেখির কারণে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন। তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন ।

তিনি যে শুধু বড়োদের জন্য লিখেছেন তা নয়, ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে — *ঝিঙেফুল*, *সঞ্চয়ন*, *পিলে পটকা*, *ঘুম জাগানো পাখি*, *ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি* এবং নাটক *পুতুলের বিয়ে*। নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর রচিত *সন্ধ্যা* গ্রন্থের অন্তর্গত 'চল্ চল্ চল্' গানটি আমাদের রণ-সংগীত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে ।

তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন ।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার দেখা বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের একটি তালিকা প্রণয়ন করো (দলীয় কাজ)।
খ. তোমার দেখা একজন শ্রমজীবী মানুষের জীবন-যাপনের উপর একটি বিবরণী লেখো (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'কুলি মজুর' কবিতায় কোনটিতে দেশ ছেয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে?

ক. মোটরে খ. জাহাজে
গ. কলে ঘ. রেলগাড়িতে

২. 'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি শ্রমজীবীদের জয়গান গেয়েছেন কারণ তারা —

i. অবহেলিত
ii. সভ্যতার নির্মাতা
iii. অধিকারবঞ্চিত

২০২১

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপমণ্ডূক 'অসংযমীর' আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

৩. **কবিতাংশের 'ক্ষুদ্রমনা' প্রসঙ্গটি 'কুলি-মজুর' কবিতার কাদের প্রতিনিধিত্ব করে?**

ক. বাবুসাবদের   খ. মিথ্যাবাদীদের
গ. দধীচিদের   ঘ. কুলি-মজুরদের

৪. **কবিতাংশের মূলভাব 'কুলি-মজুর' কবিতার কোন চরণে প্রতিফলিত হয়েছে?**

ক. দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ
খ. তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান
গ. তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান
ঘ. তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। এলাকায় একজন ভালো মানুষ হিসেবে চেয়ারম্যান আজমল সাহেবের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে, কিন্তু তাঁর ছেলে কারণে-অকারণে বাড়ির কাজের লোক, আশপাশের খেটে খাওয়া মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। চেয়ারম্যান ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন, তুমি যাদের আজ তুচ্ছ জ্ঞান করছ — সত্যিকার অর্থে তারাই আধুনিক সভ্যতার নির্মাতা, তাদের কারণেই আমরা সুন্দর জীবন যাপন করছি।

ক. 'কুলি-মজুর' কবিতা কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অর্ন্তগত?
খ. "শুধিতে হইবে ঋণ"— কথাটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. চেয়ারম্যান সাহেবের ছেলের আচরণে 'কুলি-মজুর' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে — ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'চেয়ারম্যান সাহেবের মনোভাব 'কুলি-মজুর' কবিতার মূলভাবেরই প্রতিফলন' মন্তব্যটি — বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। জগৎ জুড়িয়া দুর্বলরা মার খায় কেন?
২। দধিচি কে? তার সাথে কাদের তুলনা করা হয়েছে?
৩। কবি কেন শ্রমজীবীদের গান গেয়েছেন?
৪। 'আসিতেছে শুভদিন'– এখানে কোন দিনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

আমার বাড়ি

জসীমউদ্‌দীন

আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
বসতে দেব পিঁড়ে,
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিঁড়ে।
শালি ধানের চিঁড়ে দেব,
বিন্নি ধানের খই,
বাড়ির গাছের কবরী কলা,
গামছা-বাঁধা দই।
আম-কাঁঠালের বনের ধারে
শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাতি।

চাঁদমুখে তোর চাঁদের চুমো
মাখিয়ে দেব সুখে,
তারা ফুলের মালা গাঁথি,
জড়িয়ে দেব বুকে।
গাই দোহনের শব্দ শুনি
জেগো সকাল বেলা,
সারাটা দিন তোমায় লয়ে
করব আমি খেলা।
আমার বাড়ি ডালিম গাছে
ডালিম ফুলের হাসি,
কাজলা দিঘির কাজল জলে
হাঁসগুলি যায় ভাসি।
আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
এই বরাবর পথ,
মৌরি ফুলের গন্ধ শুঁকে
থামিও তব রথ।

শব্দার্থ ও টীকা

ভোমর	—	মৌমাছি। ভ্রমরের কথ্য রূপ ভোমর। কবিতাটিতে কোনো বন্ধু বা প্রিয়জনকে ভোমর বলে সম্বোধন করে নিজের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
শালি ধান	—	এক প্রকার আমন ধান, যা হেমন্তকালে উৎপন্ন হয়।
বিন্নি ধান	—	বাংলাদেশের আদি জাতের ধানগুলোর একটি।
কবরী কলা	—	স্বাদের জন্য বিখ্যাত এক প্রকার কলা।
'গামছা-বাঁধা দই'	—	অধিক ঘনত্বের ফলে যে দই গামছায় রাখলেও রস গড়িয়ে পড়ে না।
'শুয়ো আঁচল পাতি'	—	আঁচল পেতে শুয়ে থেকো।
'গাই দোহনের শব্দ'	—	গাভীর দুধ দোহনের শব্দ।
কাজলা দিঘি	—	কাজলের মতো কালো জলের দিঘি।

পাঠের উদ্দেশ্য

আন্তরিক অতিথি পরায়ণতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৌজন্য, শিষ্টাচার ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্য বিষয়ে সচেতন করা।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি কবি জসীমউদ্‌দীনের 'হাসু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এখানে কোনো বন্ধু বা প্রিয়জনকে নিজের গ্রামের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন কবি। তিনি তাকে আপ্যায়ন করতে চান শালি ধানের চিঁড়া, বিন্নি ধানের খই, কবরী কলা এবং গামছা বাঁধা দই দিয়ে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে কেমন করে অতিথির প্রাণ জুড়াবে তারও এক নিবিড় পরিচয় আছে কবিতাটিতে। যুগ যুগ ধরেই অতিথি আপ্যায়নে বাঙালির সুনাম রয়েছে। অতিথির বিশ্রাম ও আনন্দের জন্য গৃহস্থের আন্তরিক প্রয়াস এ কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতিথি যে গৃহে এসেছেন সেই গৃহের গাছ, ফুল, পাখিও যেন অতিথিকে আপ্যায়নে উন্মুখ হয়ে আছে। অতিথিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সৌজন্য, শিষ্টাচার ও মানবপ্রেমের অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়।

কবি-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় আমরা পল্লির মানুষ ও প্রকৃতির সহজ-সুন্দর রূপটি দেখতে পাই। পল্লির মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর কবিহৃদয় যেন এক হয়ে মিশে আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাহিনিকাব্য : *নক্সী কাঁথার মাঠ*, *সোজন বাদিয়ার ঘাট;* কাব্যগ্রন্থ : *রাখালী*, *বালুচর*, *মাটির কান্না;* নাটক : *বেদের মেয়ে*। তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *হাসু*, *এক পয়সার বাঁশী*, *ডালিমকুমার*। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার বাড়িতে অতিথি এলে কীভাবে তাঁর যত্ন নেওয়া হয়, বর্ণনা করো (একক কাজ)।

খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী খাবারসমূহের তালিকা তৈরি করো (দলীয় কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘আমার বাড়ি’ কবিতায় কবি বন্ধুকে কোন ধানের চিঁড়া খেতে দিবেন?

ক. শালি   খ. আমন
গ. বোরো   ঘ. বিন্নি

২. “থামিও তব রথ” দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. যাত্রাবিরতি   খ. বিশ্রাম গ্রহণ
গ. গন্তব্যে পৌঁছানো   ঘ. রথ থামানো

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই —
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই

ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়োতে সুখ,
পাকা জামের শাখায় উঠি
রঙিন করি মুখ।

৩. উদ্ধৃতির প্রথম স্তবকের সাথে যে চরণের মিল লক্ষ করা যায়—

i. আমার বাড়ি যাইও ভোমর / বসতে দেব পিঁড়ে।
ii. গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস / করব সারা রাতি।
iii. তারা ফুলের মালা গাঁথি / জড়িয়ে দেব বুকে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্ধৃতির দ্বিতীয় স্তবকের সাথে ‘আমার বাড়ি’ কবিতার মিল কোথায়?

ক. প্রকৃতিতে   খ. নিমন্ত্রণে
গ. খাদ্য-বর্ণনায়   ঘ. বন্ধুত্বে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তুমি যাবে ভাই — যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়,
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভায়ের স্নেহের ছায়।

ক. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কাজলা দিঘির কাজল জলে কী হাসে?

খ. 'আমার বাড়ি যাইও ভোমর'— চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি 'আমার বাড়ি' কবিতার যে ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও আতিথেয়তার দিক থেকে উদ্দীপকটি 'আমার বাড়ি' কবিতার সমতুল নয়' মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। 'আমার বাড়ি' কবিতায় ভোমর বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২। কবি ভোমরকে কী কী দিয়ে আপ্যায়ণ করাতে চান?

৩। কবি তার বন্ধুকে কোথায়, কীভাবে শুইতে দিবেন?

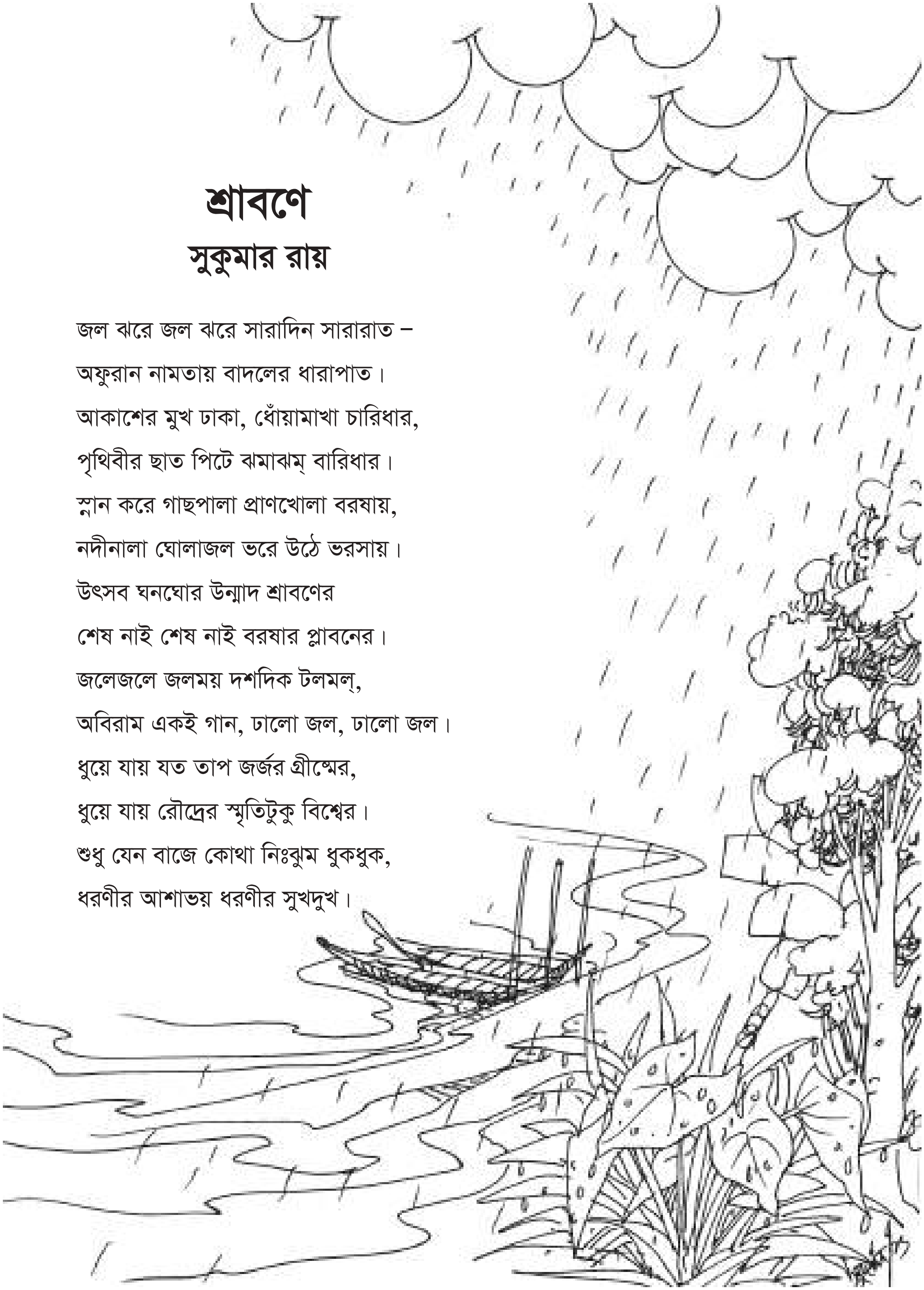

শ্রাবণে

সুকুমার রায়

জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত –
অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত।
আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম্ বারিধার।
স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,
নদীনালা ঘোলাজল ভরে উঠে ভরসায়।
উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্লাবনের।
জলেজলে জলময় দশদিক টলমল্,
অবিরাম একই গান, ঢালো জল, ঢালো জল।
ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের,
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের।
শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক,
ধরণীর আশাভয় ধরণীর সুখদুখ।

শব্দার্থ ও টীকা

‘অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত’ — গণিতে ‘নামতা’ বলতে বোঝায় গুণ করার ধারাবাহিক তালিকা; আর ‘ধারাপাত’ হলো অঙ্ক শেখার প্রাথমিক বই। এ কবিতায় বৃষ্টিধারার পতনকে বলা হচ্ছে ধারাপাত; বৃষ্টির পতনের অবিরাম রিমঝিম ধ্বনি অনেকটা যেন শিশুদের নামতা পড়ার শব্দের মতো।

ছাত — ছাদ। ছাদের কথ্য রূপ।

বারিধার — জলের ধারা।

উন্মাদ — উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত। শ্রাবণ মাসে অবিরাম ধারা বর্ষণ ঘটে বলে কবি এখানে শ্রাবণকে ‘উন্মাদ শ্রাবণ’ বলেছেন।

জর্জর — কাতর।

নিঃঝুম — নিঝুম, নীরব, নিঃশব্দ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে আকৃষ্ট করে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

‘শ্রাবণে’ কবিতাটি সুকুমার রায়ের *খাই খাই* ছড়াগ্রন্থের অন্তর্গত। গ্রীষ্মের দাবদাহে জর্জরিত প্রকৃতি অবিরাম বর্ষায় স্নান করে সজীব ও প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করেছে, কবিতায় সে ছবিই আঁকা হয়েছে। বর্ষার জলে গাছপালা নদী-নালা থেকে শুরু করে রুক্ষ প্রকৃতি মুহূর্তেই জলে পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। গ্রীষ্মকালের রোদের চিহ্ন ধুয়ে মুছে প্রকৃতি এ সময় নতুন রূপ ধারণ করে। এভাবেই ঋতুর পালাবদলের মতো মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের পালাবদল ঘটে।

কবি-পরিচিতি

শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। তাঁর আদি পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে আছেন প্রধানত রসের কবিতা, হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্য। *আবোল তাবোল*, *হ-য-ব-র-ল*, *পাগলা*, *দাশু* প্রভৃতি তাঁর অতুলনীয় রচনা। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী একজন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। কিংবদন্তি চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায় তাঁর পুত্র। সুকুমার রায়ের জন্ম কলকাতায় ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. শ্রাবণ মাসে তোমার এলাকায় কী কী পরিবর্তন ঘটে?–লেখো।

খ. বর্ষার গান ও কবিতা নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'শ্রাবণে' কবিতায় শ্রাবণের জল অবিরাম কীসের মতো ঝরে—

ক. সংগীতের মতো খ. কোলাহলের মতো
গ. গণিতের মতো ঘ. নামতার মতো

২. 'শ্রাবণে' কবিতায় 'অবিরাম একই গান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. বর্ষার প্লাবন
খ. নদীর ঘোলাজল
গ. একটানা বৃষ্টি
ঘ. সংগীত সন্ধ্যা

৩. বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
– উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. অবিরাম বৃষ্টি
খ. মেঘলা আকাশ
গ. বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতি
ঘ. গ্রীষ্মের তাপ হ্রাস

৪. 'বৃষ্টি এল কাশবনে জাগল সাড়া ঘাসবনে'—**চরণটির ভাবার্থ 'শ্রাবণে' কবিতার কোন পঙ্ক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে?**

ক. অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত
খ. আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার
গ. স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়
ঘ. নদীনালা ঘোলাজল ভরে উঠে ভরসায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক (১) আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে– ঘোলাটে মেঘের আড়ে,
কেয়া বন পথে স্বপন বুনিছে– ছল ছল জলধারে।
কাহার ঝিয়ারী কদম্ব শাখে– নিঝ্‌ঝুম নিরালায়,
ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দিয়াছে– অস্ফুট কলিকায়।

উদ্দীপক (২) কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল সুতার মায়াবী আখর টানি।

ক. ‘শ্রাবণে’ কবিতায় প্রাণখোলা বর্ষায় কে স্নান করে?

খ. ‘উন্মাদ শ্রাবণ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপক (১) এ ‘শ্রাবণে’ কবিতায় বর্ণিত বর্ষার কোন দিকটি চিত্রিত হয়েছে? – বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপক (২) এর ভাব ‘শ্রাবণে’ কবিতার শেষ চরণে প্রতিফলিত হয়েছে কি? – যুক্তিসহ বিচার করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১। শ্রাবণে প্রকৃতির কীরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়?

২। কবিতায় ধারাপাত বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

৩। শ্রাবণে মানব মনে কী প্রভাব তৈরি করে? ব্যাখ্যা করো।

৪। শ্রাবণের বৃষ্টিতে গ্রীষ্মের তাপ কীভাবে ধুয়ে যায়?

গরবিনী মা-জননী

সিকান্‌দার আবু জাফর

ওরে আমার মা-জননী
জন্মভূমি বাঙলারে
তোর মত আর পুণ্যবতী
ভাগ্যবতী বল মা কে ॥

কার চোখে মা নদীর কাজল
সবুজ তৃণের আঁচল বুকে
কার পায়ে মা ধুলোর নূপুর
সন্ধ্যা দুপুর বেজেই চলে।
রোজ ভোরে কে শিশির খোঁপায়
বকুল যুঁথীর গন্ধ মাখে
কার দুপুরের তন্দ্রা ভেজে
ক্লান্ত ঘুঘুর বিলাপ-জলে ॥

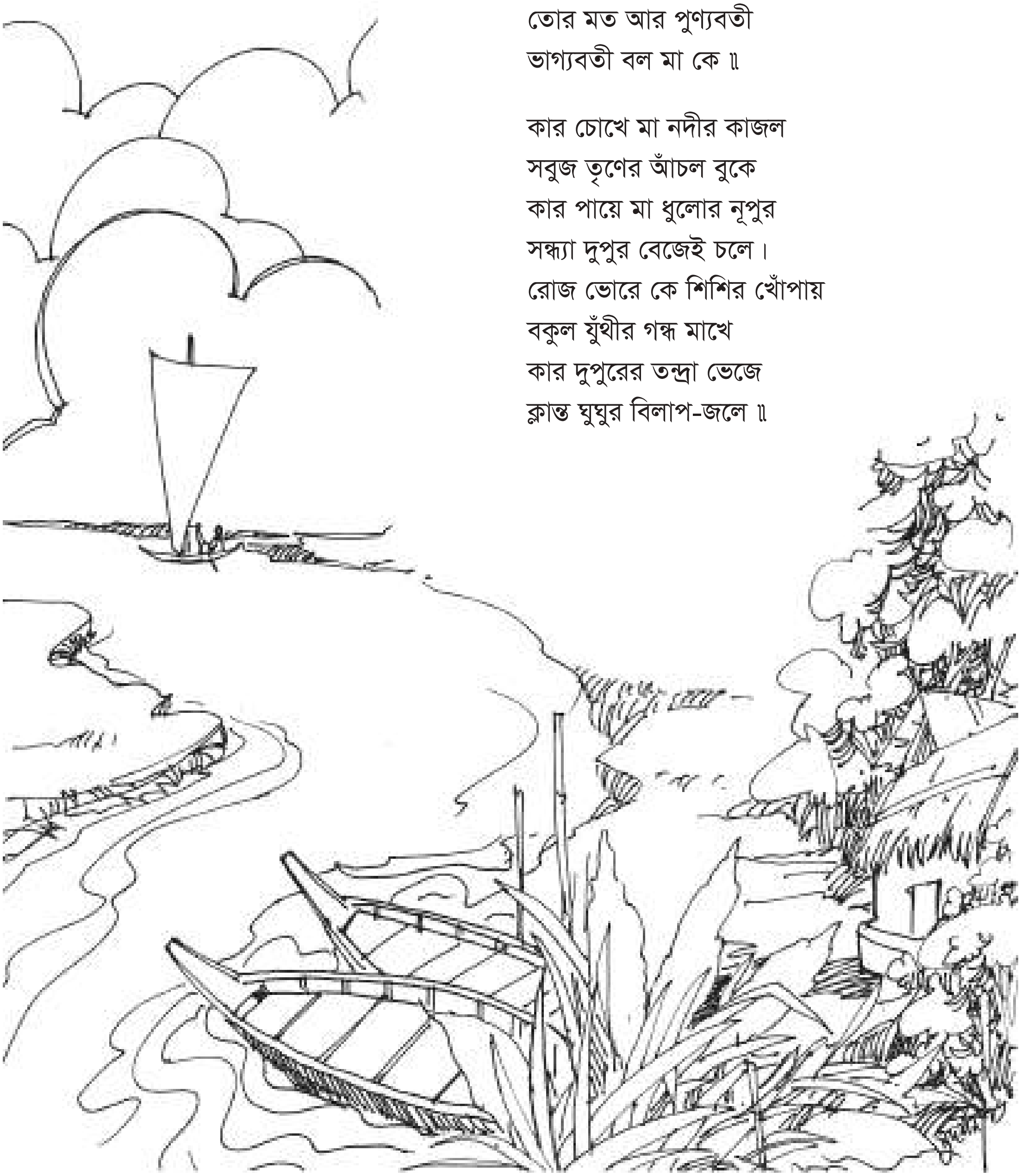

কামার কুমোর জেলে চাষী
বাউল মাঝি ঘর-উদাসী,
কার ছেলেরা নিত্য হাজার
মরণ-মারের দণ্ড গোনে,
ছেলের বুকের খুন ছোপানো
কোন্ জননীর আঁচল-কোণে
দুর্ভাগিনী কার মেয়েরা
কান্নাফুলের নকশা বোনে ॥

সেই মাকে যার হাজার হাজার
মা-নাম-ডাকা পাগল ছেলে
মায়ের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে
ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে।
কার ছেলে মা উপড়ে ফ্যালে
বুলেট ফাঁসির শাসন-কারা
দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে
কার ছেলে মুখ উজল রাখে ॥

তুই তো সে-মা
ও মা তুই তো রে সেই গরবিনী
রক্তে-ধোওয়া সরোজিনী
যুগ-চেতনার চিত্তভূমি
নিত্যভূমি বাঙলারে ॥

(সংক্ষেপিত)

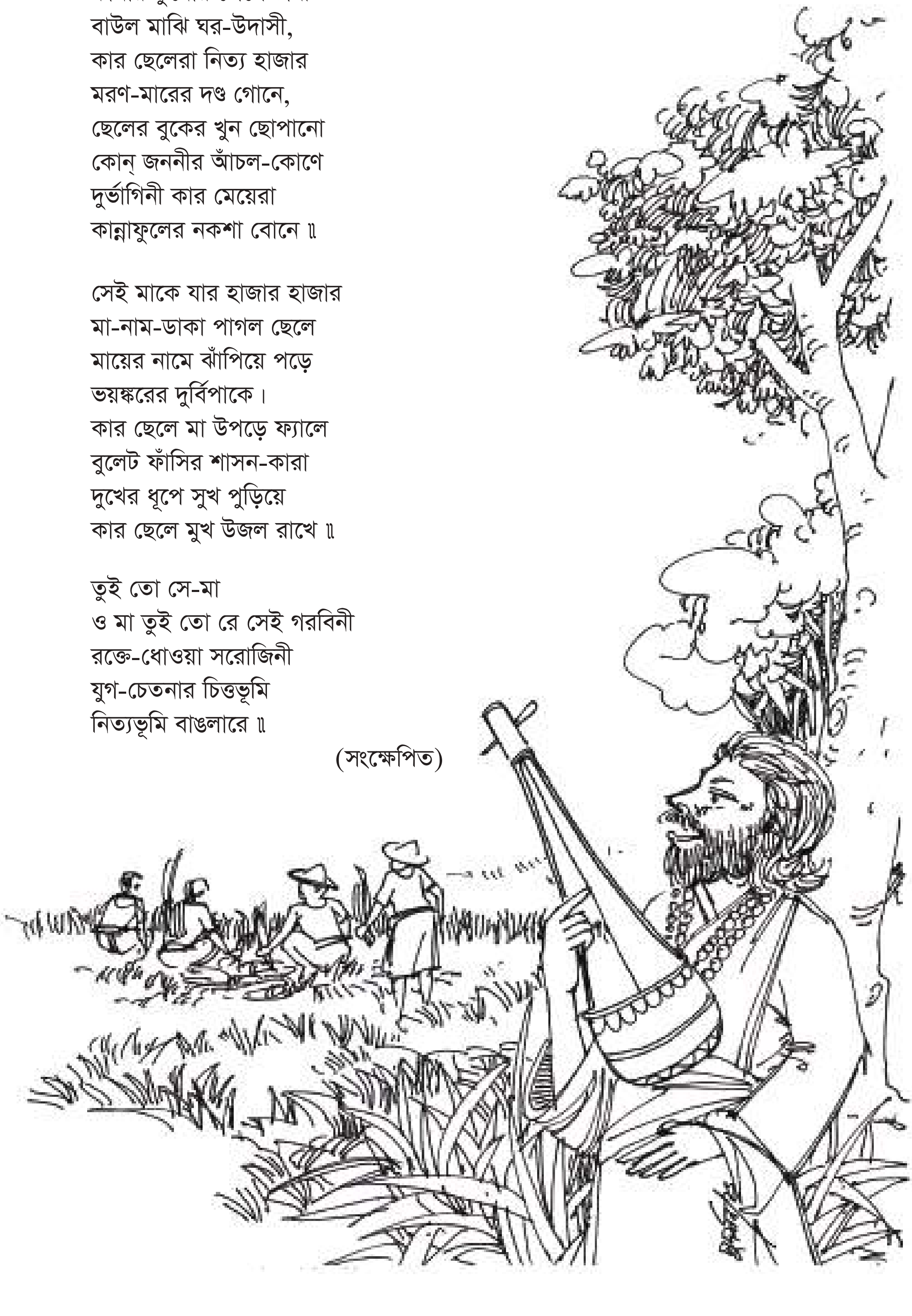

শব্দার্থ ও টীকা

পুণ্যবতী —— পুণ্য বা ভালো কাজ করেন এমন নারী।

সরোজিনী —— সরোজ মানে পদ্ম – সরোজের স্ত্রীবাচক রূপ সরোজিনী। এ কবিতায় দেশমাতৃকা বাংলাকে তুলনা করা হয়েছে কমনীয় পদ্মের সঙ্গে।

'মরণ-মারের দণ্ড' —— মরণের আঘাত থেকে প্রাপ্ত শাস্তি।

ছোপানো —— ছোপ মানে ছাপ, রঙ। এখানে ছোপানো মানে রাঙানো।

পাগল ছেলে —— বাংলার মুক্তিকামী বিদ্রোহী ও তরুণ-যুবকেরাই 'পাগল ছেলে' – যারা নির্ভয়ে যুদ্ধে-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল।

'ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে' —— ভীতিকর দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা। এখানে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।

শাসন-কারা —— পাকিস্তানি দুঃশাসন – যা ছিল কারাগারের সমান।

উজল —— উজ্জ্বল শব্দটির কোমল রূপ।

'যুগ-চেতনার চিত্তভূমি / নিত্যভূমি বাঙলারে' —— যুগের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা চিরন্তন দেশমাতৃকা বাংলাদেশ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বদেশ চেতনার উন্মেষ ঘটবে। স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধ জাগবে।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি *বাঙলা ছাড়ো* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। উপর্যুক্ত কবিতাটিতে পুণ্যবতী ভাগ্যবতী দেশমাতার গর্বিত হয়ে ওঠার কারণ অন্বেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী থেকে শুরু করে সব পেশাজীবী সন্তান এই মায়ের কোল জুড়ে থাকে। এই মাকে রক্ষা করার জন্য এই সন্তানরা শত কষ্ট সহ্য করে, তবে কোনো অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারকে তাঁরা মেনে নিতে পারে না। মাকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে তাঁরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও দ্বিধা করে না। আবার এই মাকেও সন্তানের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখতে হয়। সন্তানকে সাহস ও শক্তি জোগাতে হয়। দেশমাতৃকাকে সকল দুঃশাসন থেকে রক্ষার জন্য মায়ের সন্তানরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁরা যে কোনো দুঃসময়ে জেল জুলুম ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে নিজের সুখ শান্তি ও আলস্য পরিহার করে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। যুগের দাবি ও সময়ের দাবি রক্ষায় যে সন্তানরা সাহসের সাথে সংগ্রামের পথ বেছে নেয়, তাঁদের জন্য বাংলাদেশ সত্যিই গর্বিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মাটি এই সাহসী ও সংগ্রামী জনতার ভিত্তিভূমি।

কবি-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও সাংবাদিক। জন্মেছেন সাতক্ষীরা জেলায়। জন্মসাল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ। পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। *প্রসন্ন প্রহর*, *তিমিরান্তিক*, *বাঙলা ছাড়ো* প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* তাঁর বিখ্যাত নাটক। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৫ সালে।

২০২৫

কর্ম-অনুশীলন

ক. দেশপ্রেমমূলক কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করো।(দলগত কাজ)।

খ. আবহমান বাংলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক আন্দোলনে বাঙালির আত্মদানের ইতিকথা বর্ণনা করো। (৩০০ শব্দের মধ্যে)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায় মায়ের আঁচল কোণে কী লেগে আছে?

ক. বকুল যুঁথীর গন্ধ খ. কান্না ফুলের নকশা

গ. ছেলের বুকের খুন ঘ. সবুজ তৃণ

২. 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায় 'দুর্ভাগিনী মেয়ে' বলে কাদের বোঝানো হয়েছে?

ক. বাংলার অবহেলিত মেয়েদের

খ. বাংলার গ্রামীণ মেয়েদের

গ. দুর্ভাগ্য জর্জরিত মেয়েদের

ঘ. যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েদের

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমরা অপমান সইব না
ভীরুর মত ঘরের কোণে রইব না
আমরা আকাশ থেকে বজ্র হয়ে ঝরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

৩. উদ্দীপকের চেতনা নিচের কোন চরণে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. কার ছেলেরা নিত্য হাজার
মরণ-মারের দণ্ড গোনে

খ. ছেলের বুকের খুন ছোপানো
কোন জননীর আঁচল কোণে

গ. মায়ের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে
ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে

ঘ. দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে
কার ছেলে মুখ উজল রাখে

৪। **উক্ত চেতনা হলো–**

i. স্বদেশ চেতনা
ii. প্রতিবাদী চেতনা
iii. প্রকৃতি চেতনা

কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. ii, iii
গ. i, iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মা দিবসে রত্নগর্ভা স্বীকৃত মায়েদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাহেদা বেগমের বড় ছেলে সাজিদ অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন — আমাদের মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। আমরা পিঠাপিঠি পাঁচ ভাই-বোন যখন খুব ছোটো, তখনই বাবাকে হারালাম। মাকে কখনো ভেঙে পড়তে দেখিনি। দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাব আমাদের নিত্য সঙ্গী ছিল। মা সব সময় আমাদেরকে খুশি রেখে, পড়াশুনা শিখিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তোমাকে শত সালাম মা। তোমার মুখের হাসির জন্য আমরা যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

ক. 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায় সন্ধ্যা দুপুর মার পায়ে কী বাজে?

খ. 'রক্তে ধোওয়া সরোজিনী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. সাজিদের বক্তব্যে 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার যে বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ''প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার বক্তব্য একই ধারায় প্রবাহিত।'' মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। বাংলা মা-জননীকে পূণ্যবতী ও ভাগ্যবতী বলা হয়েছে কেন?
২। বাংলার পাগল ছেলেরা মায়ের নামে কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে?
৩। বাংলার ছেলেরা কীভাবে মরণ-মারের দণ্ড গোনে?
৪। কবিতায় পাগল ছেলে বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?

২০২১

সাম্য

সুফিয়া কামাল

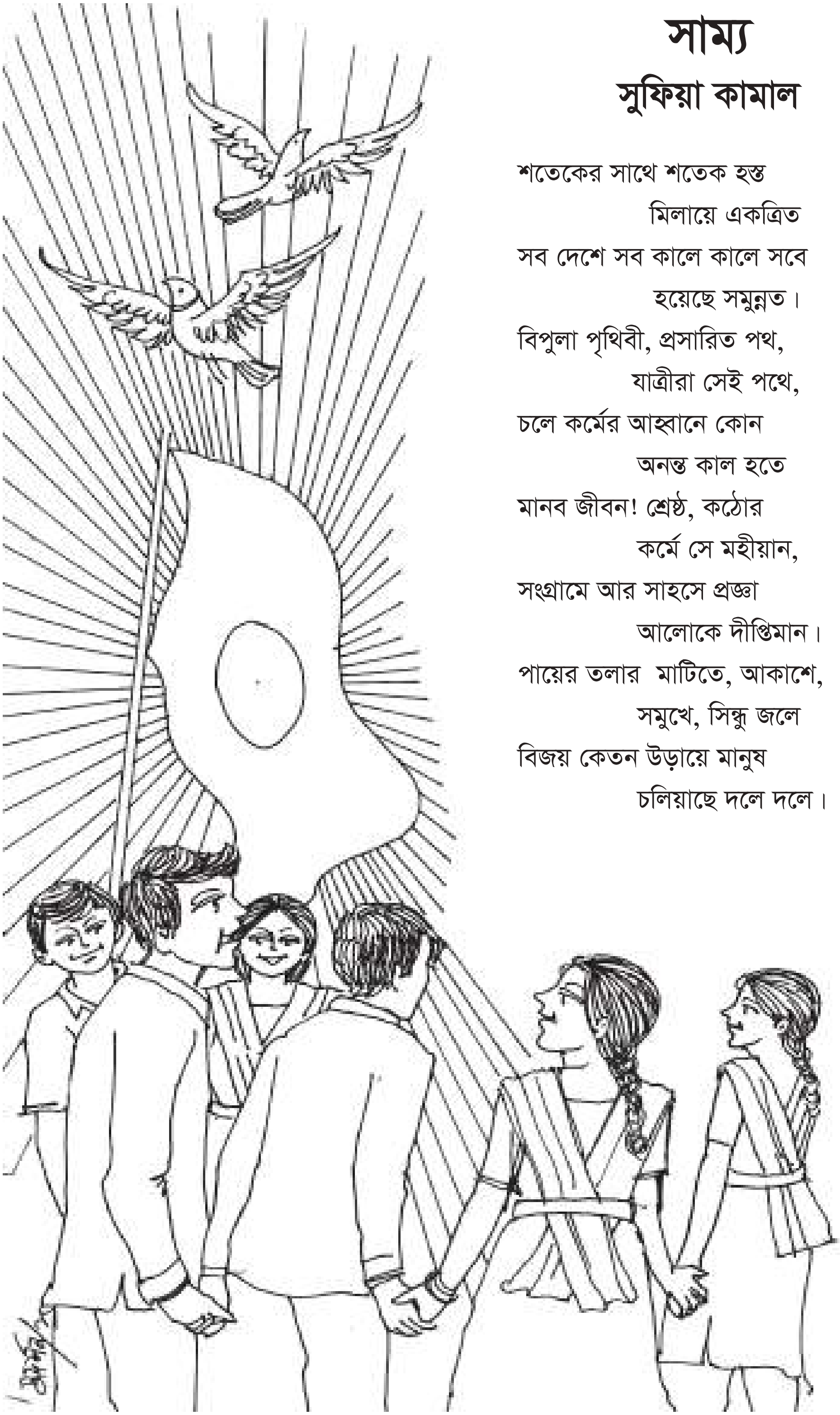

শতেকের সাথে শতেক হস্ত
মিলায়ে একত্রিত
সব দেশে সব কালে কালে সবে
হয়েছে সমুন্নত।
বিপুলা পৃথিবী, প্রসারিত পথ,
যাত্রীরা সেই পথে,
চলে কর্মের আহ্বানে কোন
অনন্ত কাল হতে
মানব জীবন! শ্রেষ্ঠ, কঠোর
কর্মে সে মহীয়ান,
সংগ্রামে আর সাহসে প্রজ্ঞা
আলোকে দীপ্তিমান।
পায়ের তলার মাটিতে, আকাশে,
সমুখে, সিন্ধু জলে
বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ
চলিয়াছে দলে দলে।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

শতেক	—	একশত।
সমুন্নত	—	অতিশয় উঁচু।
বিপুল	—	বিশাল।
প্রসারিত	—	বিস্তার লাভ করেছে এমন।
অনন্ত	—	যার অন্ত বা শেষ নেই।
মহীয়ান	—	সুমহান।
সংগ্রাম	—	লড়াই।
প্রজ্ঞা	—	গভীর জ্ঞান।
দীপ্তিমান	—	উজ্জ্বল।
সিন্ধু	—	সমুদ্র, সাগর।
কেতন	—	পতাকা।

পাঠের উদ্দেশ্য

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বোধ সৃষ্টি করা।

পাঠ-পরিচিতি

'সাম্য' কবিতাটি নওল কিশোরের দরবারে গ্রন্থভুক্ত 'মিলিত সেবা ও সাম্য প্রীতিতে' কবিতার অংশবিশেষ। কোনো বড়ো কাজ কেউ একা করতে পারে না। সে জন্য দরকার হয় অনেক মানুষের মিলিত অংশগ্রহণ। সকলকে নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে পৃথিবীর বহু দেশ উন্নত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক মহৎ কাজের পেছনেই ছিল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অসীম সাহস, সম্মিলিত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ এই পৃথিবীতে তার বিজয় ঘোষণা করেছে। এ জন্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি ভেদে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল **১৯১১** সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সফল সংগঠক ও নারীনেত্রী। তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সকল আন্দোলন-সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে নারীজাগরণ বিশেষ করে নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ — *সাঁঝের মায়া*, *মায়া কাজল*, *কেয়ার কাঁটা*। তিনি **১৯৯৯** সালে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে, তার পরিকল্পনা প্রস্তুত কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সাম্য’ কবিতায় কর্মের আহ্বানে মানুষ কত দিন হতে চলছে?

ক. সহস্রাব্দকাল খ. অনন্তকাল

গ. শতাব্দীকাল ঘ. ঐতিহাসিক কাল

২. কবি সুফিয়া কামালের মতে কালে কালে মানুষ কীভাবে সমুন্নত হয়েছে?

ক. সম্মিলিত প্রয়াসে খ. একক প্রয়াসে

গ. সভ্যতার বিকাশে ঘ. অর্থনৈতিক বিকাশে

উদ্ধৃতাংশ পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

(১) একতাই বল

(২) পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

৩. উদ্ধৃতাংশ (১) এর ভাবের সাথে ‘সাম্য’ কবিতার যে চরণের ভাবের মিল আছে তা হলো–

i. বিপুলা পৃথিবী, প্রসারিত পথ / যাত্রীরা সেই পথে

ii. শতেকের সাথে শতেক হস্ত / মিলায়ে একত্রিত

iii. বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ / চলিয়াছে দলে দলে

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্ধৃতাংশ (২) এর ভাবের সাথে ‘সাম্য’ কবিতার কোন ভাবের মিল আছে?

ক. সংগ্রামে সাফল্য খ. ঐক্য ও প্রচেষ্টা

গ. সম্মিলিত অবস্থান ঘ. সাহস ও পরিশ্রম

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অমিত সাহেব একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে এত বিশাল কাজ সম্পাদন কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। তিনি কারও সহযোগিতা নিতে সম্মত নন। পরে গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এখন সবাই পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারছে।

ক. ‘সাম্য’ কবিতায় কীসের মাধ্যমে জীবন মহীয়ান হয়?

খ. ‘শতকের সাথে শতকের হস্ত’ চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অমিত সাহেবের চরিত্রে ‘সাম্য’ কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “উদ্দীপকের মূলভাব যেন ‘সাম্য’ কবিতার মূলভাবেরই প্রতিরূপ।” মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। সব দেশে সব কালে সবাই সমুন্নত হয়েছে কীভাবে?

২। মানুষ কর্মে কীভাবে মহীয়ান হয়?

৩। ‘বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ’– চরণটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

৪। মানব জীবন শ্রেষ্ঠ হয় কীভাবে?

২০২৫

কোরানের বাণী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

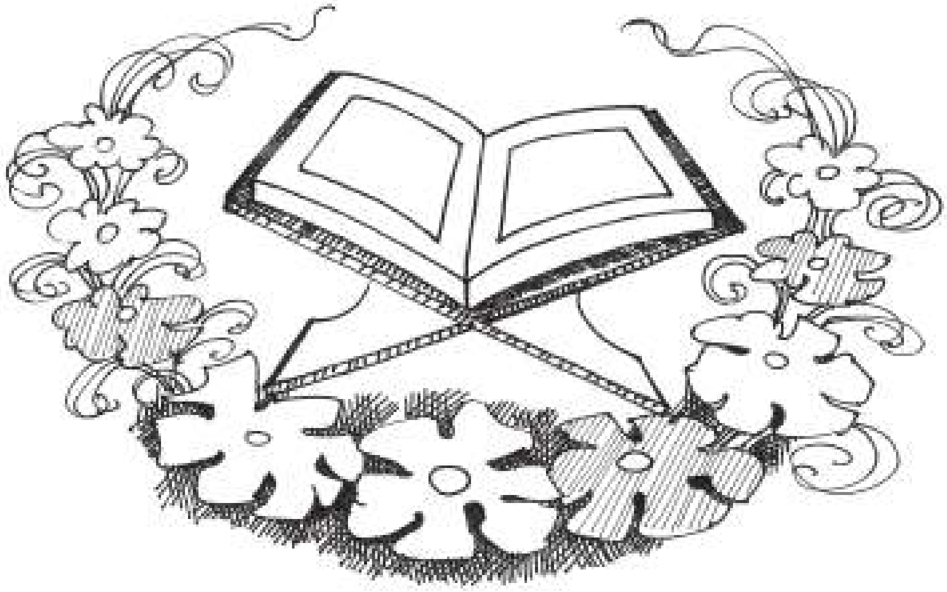

মধ্যদিনের আলোর দোহাই,
নিশার দোহাই ওরে
প্রভু তোরে ছেড়ে যাননি কখনো,
ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো
হবে রে ভবিষ্যৎ,
একদিন খুশি হবি তুই লভি
তার কৃপা সুমহৎ।
অসহায় যবে আসিলি জগতে
তিনি দিয়াছেন ঠাঁই–
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দুঃখ যা ছিল
ঘুচায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি তিনিই সুপথ
দেখায়ে দেছেন তোরে,
সে কৃপার কথা স্মরণে রাখিস;
অসহায় জনে ওরে
দলিস না কভু ভিখারি আতুর
বিমুখ যেন না হয়
তাঁর করুণার বারতা ঘোষণা
করবে দুনিয়াময়।

২০২৩

শব্দার্থ ও টীকা

মধ্য দিনের আলোর দোহাই- আরব মরুময় দেশ। সূর্যের প্রখরতা এখানে বেশি। বিশেষ করে মধ্যাহ্নে সূর্য প্রচণ্ড প্রখর হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে রাত্রির অন্ধকারকে সবাই ভয় পায়। তাই তৎকালীন আরবের লোকেরা কোনো কিছুর জন্য শপথ করলে মধ্য দিনের আলো ও রাত্রির দোহাই দিত।

নিশা — রাত্রি।

লভি — লাভ করে।

কৃপা — দয়া।

সুপথ — ভালোপথ, আরবের লোকেরা পূর্বে প্রতিমা পূজা করত। তারা ছিল ভুল পথে। এই আরবদের এক বংশেই হযরত মুহাম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেন।

স্মরণে — মনে।

অসহায় — সহায়হীন, দরিদ্র।

দলিস না কভু — কখনো পদদলিত করিস না, অর্থাৎ জুলুম করিস না।

বিমুখ — নিরাশ।

বারতা — বার্তা, খবর।

জগৎময় — সারা বিশ্বে।

পাঠের উদ্দেশ্য

মহাগ্রন্থ আল কুরআন পাঠের গুরুত্ব অনুধাবন করা।

পাঠ-পরিচিতি

'কোরানের বাণী' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি অনুবাদ কবিতা। এটি তিনি অনুবাদ করেছেন কুরআন শরিফের সুরা আদ-দোহা থেকে। সুরাটি নাযিল হয়েছিল মক্কায়। তখন বেশ কিছুকাল হযরতের নিকট ওহি নাযিল হচ্ছিল না। তাঁর দুশমনরা তাই প্রচার করতে থাকে যে, আল্লাহ মুহাম্মদ (স.) কে ভুলে গেছেন। ওহি নাযিল না হওয়ায় হযরতও চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সময়ই আল্লাহ রাসুলকে আশ্বস্ত করার জন্য মধ্য দিনের আলো ও রাত্রির দোহাই দিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাকে ভুলেন নি। অতীতের চেয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ আরও ভালো হবে এবং তিনি আল্লাহর কৃপা লাভ করে খুশি হবেন। তিনি যখন ইয়াতীম হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন আল্লাহই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অত:পর তিনি যখন সুপথের সন্ধান করছিলেন তখন আল্লাহ তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সেই দয়ার কথা স্মরণ করে তিনি যেন কোনো অসহায় জনের উপর জুলুম না করেন। তিনি যেন ভিখারি-আতুরকে সাহায্য করেন এবং করুণাময় আল্লাহর দয়ার কথা সারা বিশ্বে প্রচার করেন।

লেখক-পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'ছন্দের যাদুকর' হিসেবে পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো: সবিতা, বেনু ও বীনা, কুহু ও কেকা, বেলাশেষের গান প্রভৃতি। তিনি ১৯২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

১। সুরা ফাতিহার ভাবানুবাদ করে এর মূল শিক্ষার বিষয়গুলো দলে আলোচনা করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বলা হয়-

ক. ছন্দের যাদুকর
খ. স্বভাব কবি
গ. গ্রাম বাংলার কবি
ঘ. মহাকবি

২. 'মধ্যদিনের আলোর দোহাই, নিশার দোহাই ওরে'-এখানে কবি দিনের আলো দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন?

ক. দিন-রাত্রি
খ. কোনো কিছুর শপথ
গ. আলো আঁধারের খেলা
ঘ. আঁধারের আলো

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

অসহায় যবে আসিলি জগতে
তিনি দিয়াছেন-ঠাঁই-
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দুঃখ যা ছিল
ঘুচায়ে দেছেন তাই
পথ ভুলেছিলি তিনিই সুপথ
দেখায়ে দেছেন তোরে
সে কৃপার কথা স্মরণে রাখিস;
অসহায় জনে ওরে

৩. **উদ্দীপকে কোন মহামানবের আগমনের কথা বলা হয়েছে?**

ক. হজরত মুহাম্মদ (স.)
খ. হজরত মুসা (আ.)
গ. হজরত ঈসা (আ.)
ঘ. হজরত আদম (আ.)

৪. **উদ্দীপকটি কবিতার যে ভাবকে ধারণ করে তা হলো—**

i. সঠিক পথের সন্ধান
ii. মহান প্রভূর স্মরণ
iii. অসহায়ের সহায়

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মসজিদে জনৈক ইমাম সাহেব বললেন, আল্লাহর রাসুল এমন সময় জন্মগ্রহণ করেন যখন আরব জাহানে অত্যাচার, নির্যাতনে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছিল। দরিদ্র ইয়াতীম ও নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। এই সময়ে রাসুল (স.) কয়েকজন যুবকদের নিয়ে হিলফ উল ফুযুল গঠন করেন এবং অসহায় নির্যাতিত মানুষকে সহায়তা দান করেন, এছাড়া ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

ক. 'কোরানের বাণী' কোন সুরার অনুবাদ?

খ. কোন পটভূমিতে এই সুরাটি নাযিল হয়?

গ. 'অসহায় যবে আসিলি জগতে
তিনি দিয়াছেন ঠাঁই'— উদ্দীপকের সাথে এই উক্তিটির সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. ইমাম সাহেবের কথাগুলো 'কোরানের বাণী' কবিতার মূল বক্তব্যের সাথে মিলে যায়— বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। মহানবি (স.) কীভাবে সুপথ প্রাপ্ত হয়েছেন?

২। 'মধ্য দিনের আলোর দোহাই' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৩। আল্লাহ তার কৃপার কথা স্মরণ করিয়ে নবিকে কী আদেশ দিয়েছেন?

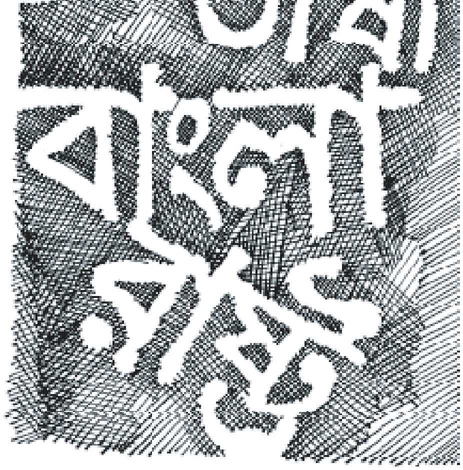

এই অক্ষরে

মহাদেব সাহা

এই অক্ষর যেন নির্ঝর
ছুটে চলে অবিরাম
যেন কিছু তারা দিচ্ছে পাহারা
আকাশেতে লিখে নাম ।
অক্ষরগুলি চায় মুখ তুলি
অন্তরে জাগে গান,
শিখি তার কাছে অজানা যা আছে
আনন্দে ভরে প্রাণ;

এই অক্ষরে মাকে মনে পড়ে
মন হয়ে যায় নদী,
আর কিছু তাই পাই বা না পাই
চিঠিখানা পাই যদি ।
সেই উপমায় মন ভরে যায়
দেখি অপরূপ ছবি —
সকাল দুপুর সুরের নূপুর
বাজায় উদাস কবি ।

এই অক্ষরে ডাক নাম ধরে
ডাক দেয় বুঝি কেউ,
স্বপ্নের মতো রূপকথা যতো
অন্তরে তোলে ঢেউ ।

এই অক্ষর আত্মীয়-পর
সকলেরে কাছে টানে,
এই প্রিয় ভাষা বুকে দেয় আশা
বিমোহিত করে গানে ।

এই অক্ষরে কঠিন পাথরে
শিলালিপি লেখা হয়,
এই ভাষা দিয়ে গান লিখে নিয়ে
যুদ্ধ করেছি জয় ।

শব্দার্থ ও টীকা

অক্ষর — শব্দের যে অংশটুকু একবারে উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বলে। সাধারণ কথাবার্তায় অক্ষর বলতে বর্ণও বোঝানো হয়। এখানে বৃহৎ অর্থে মাতৃভাষা বোঝানো হয়েছে।

নির্ঝর — ঝরনা।

'এই অক্ষর যেন নির্ঝর ছুটে চলে অবিরাম' — আমরা আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলি, লিখি। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তা-ই করতেন। তাই বলা হয়েছে মাতৃভাষা অবিরাম ছুটে চলেছে। মানে মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা নানা কাজ করে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি।

'যেন কিছু তারা দিচ্ছে পাহারা আকাশেতে লিখে নাম' — এক সময়ে আমাদের এই দেশ পরাধীন ছিল। শাসকেরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু তখনকার সচেতন বাঙালিরা এ অধিকার আদায় করে নেয়। সে অধিকার আদায় করার জন্য অক্ষরগুলো যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে আছে।

'এই অক্ষরে মাকে মনে পড়ে' — মায়ের কাছ থেকেই আমরা মাতৃভাষা প্রথম শিখি। তাই অক্ষর বা ভাষার দৃষ্টান্ত দেখলেই মাকে মনে পড়ে যায়।

উপমা — তুলনা।

অপরূপ — খুব সুন্দর।

নূপুর — পায়ে পরার অলংকার।

রূপকথা — রাজা-বাদশা, রাজপুত্র-রাজকন্যা, দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্ষস প্রভৃতি কাহিনি নিয়ে কাল্পনিক গল্পকে বলে রূপকথা।

শিলালিপি — পাথরে খোদাই করা লেখা। অনেক দিন স্থায়ী করে রাখার জন্য কোনো কিছু পাথরে বা তামার পাতে লিখে রাখা হতো। এরকম পাথরের ওপর লেখাকে বা ঐ পাথরের খণ্ডটিকে বলা হয় শিলালিপি।

'এই ভাষা দিয়ে গান লিখে নিয়ে যুদ্ধ করেছি জয়' — এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মাতৃভাষার মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাই কবি বলেছেন যে এই ভাষা দিয়ে আমরা লিখেছি মুক্তির গান। আর সেই গান মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। সুতরাং মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন থেকে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা।

পাঠের উদ্দেশ্য

মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ জাগ্রত করা ।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলা অক্ষর বা বর্ণমালা বাঙালি জাতির অনন্য সম্পদ। এই বর্ণমালা বাঙালির প্রাণের সঙ্গে অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। বাংলা অক্ষর বাঙালির চিত্তকে আনন্দে ভরে দেয়। বাঙালিকে করে তোলে স্বপ্নমুখী। বাংলা অক্ষর বাঙালির চোখে দেখা দেয় মায়ের রূপ ধরে। কখনো তার চিত্তে বাজায় সুরের নূপুর।

বাংলা অক্ষর বাঙালির মিলিত সত্তার শ্রেষ্ঠতম উৎস। আমাদের অক্ষরসমূহ আপন-পর সকলকে কাছে টানে, দূর করে দেয় সব বিভেদ। বাংলা অক্ষর বাঙালির বুকে সঞ্চার করে অবারিত আশা। আলোচ্য কবিতাটিতে বাংলা অক্ষর তথা বর্ণমালার প্রতি কবির অবারিত ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

কবি মহাদেব সাহা ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব সাহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: *এই গৃহ এই সন্ন্যাস*, *অস্তমিত কালের গৌরব*, *টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর*, *ছবি আঁকা পাখির পাখা*, *সরষে ফুলের নদী* ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার পূর্বে পড়া বাংলা ভাষাবিষয়ক একটি গল্প বা কবিতা অবলম্বনে একটি রচনা তৈরি করো (একক কাজ)।

খ. ভাষা-আন্দোলন নিয়ে রচিত কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করো (দলীয় কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এই অক্ষরে কবিতায় কাকে মনে পড়ার কথা বলা হয়েছে?

ক. প্রিয়জনকে খ. মাকে
গ. দেশকে ঘ. ভাষাকে

২. 'এই অক্ষর যেন নির্ঝর / ছুটে চলে অবিরাম' – চরণদ্বয় দ্বারা কবি বুঝিয়েছেন—

i. মাতৃভাষায় আমরা অতীত ইতিহাস জানি
ii. বর্তমানকে আমরা মাতৃভাষায় বুঝতে পারি
iii. আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্নও বুনি মাতৃভাষায়

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

কবিতাংশ পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

(১) বাংলার গল্প বাংলার গীত
শুনিলে এ চিত্ত সদা বিমোহিত

(২) সুখে দুঃখে তারা এসে মোর পাশে
তোষে সদা মোরে মধুর সম্ভাষে

৩. ১ নং কবিতাংশে 'এই অক্ষরে' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. ভাষাপ্রীতি খ. প্রকৃতিপ্রীতি
গ. মর্ত্যপ্রীতি ঘ. স্বদেশপ্রীতি

৪. ২নং কবিতাংশের বক্তব্য নিচের যে চরণে প্রকাশ পেয়েছে—

i. এই অক্ষরে / ডাকনাম ধরে / ডাক দেয় বুঝি কেউ
ii. এই অক্ষর / আত্মীয়-পর / সকলেরে কাছে টানে
iii. এই অক্ষরে / মাকে মনে পড়ে / মন হয়ে যায় নদী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আর তাই তো কখনো আমি পড়তে দিই নি ধুলো, এই কালো
এ-কারে আ-কারে
তারা যেন ক্ষেতের সোনালি পাকা ধান, থোকা থোকা
পড়ে থাকা জুঁই।
তোমার জন্য জয় করেছি একটি যুদ্ধ
একটি দেশের স্বাধীনতা।

ক. 'এই অক্ষরে' কবিতায় কঠিন পাথরে কী লেখা হয়?

খ. 'এই অক্ষরে মাকে মনে পড়ে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? – ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের 'তারা' 'এই অক্ষরে' কবিতার কিসের সাথে তুলনীয়? – ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণে 'এই অক্ষরে' কবিতার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবার্থ ফুটে উঠেছে।" – উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। এই অক্ষরের মধ্য দিয়ে কী মনে পড়ে?

২। শিলালিপি কী? এতে কেন লিখে রাখা হতো?

৩। 'এই অক্ষর যেন নির্ঝর ছুটে চলে অবিরাম'– চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

৪। রূপকথা বলতে কী বুঝায়?

সিঁথি

হাসান রোবায়েত

ভাই মরল রংপুরে সেই
রংপুরই তো বাংলাদেশ
নুসরাতেরা আগুন দিল
দোজখ যেন ছড়ায় কেশ।

কওমি তরুণ দাঁড়ায়া ছিল
কারবালারই ফোরাতে
শাহাদাতের আগুন দিয়া
খুনির আরশ পোড়াতে।

পোলা গেছে মাইয়া গেছে
দুয়ার খুইলা রাখছে মায়
ভাই-বইনে আইছে ফিরা
রক্তভেজা খাটিয়ায়।

মরা পুতরে কোলে নিয়া
মা ফিরছে অটোতে
রোজ পোলারে খোঁজে অহন
আইডি কার্ডের ফটোতে।

চক্ষু দিল পা-ও দিল
সারা বাংলায় কাফন শ্যাষ
গোরস্থানে কান্দে শহিদ –
পঙ্গু যেন হয় না দ্যাশ।

মায়ের ওড়না বাইন্ধা মাথায়
পুত মিছিলে হারাইল প্রাণ
ঘাস কান্দে গাছ কান্দে
কান্দে বাঁশের গোরস্থান।

খোদার আরশ কাঁইপা ওঠে
শুইনা বাপের হাহাকার
একটা মানুষ মারার লাগি
কয়টা গুলি লাগে ছার?

লাশের ভিতর লাশ ডুইবা যায়
রাতের হাওয়ায় কিসের লাল
সারা আকাশ ছাইয়া আছে
কোন শহিদের গায়ের শাল?

চিরকালই স্বাধীনতা
আসে এমন রীতিতে
কত রক্ত লাইগা আছে
বাংলাদেশের সিঁথিতে।

শব্দার্থ ও টীকা

শাহাদাত	– শহিদ হওয়া; ধর্ম, ন্যায় ও সত্য রক্ষার বা প্রতিষ্ঠার কাজে নিহত হওয়া।
আরশ	– সর্বব্যাপী খোদার আসন।
খাটিয়া	– ক্ষুদ্র খাট, সাধারণত যা দড়ি দিয়ে ছাওয়া হয়।
আইডি কার্ড	– পরিচয়পত্র।
গোরস্থান	– কবরস্থান; সমাধিক্ষেত্র।
সিঁথি	– মাথার চুল দুইভাগে বিন্যস্ত করে যে সরু রেখা সৃষ্টি হয়।

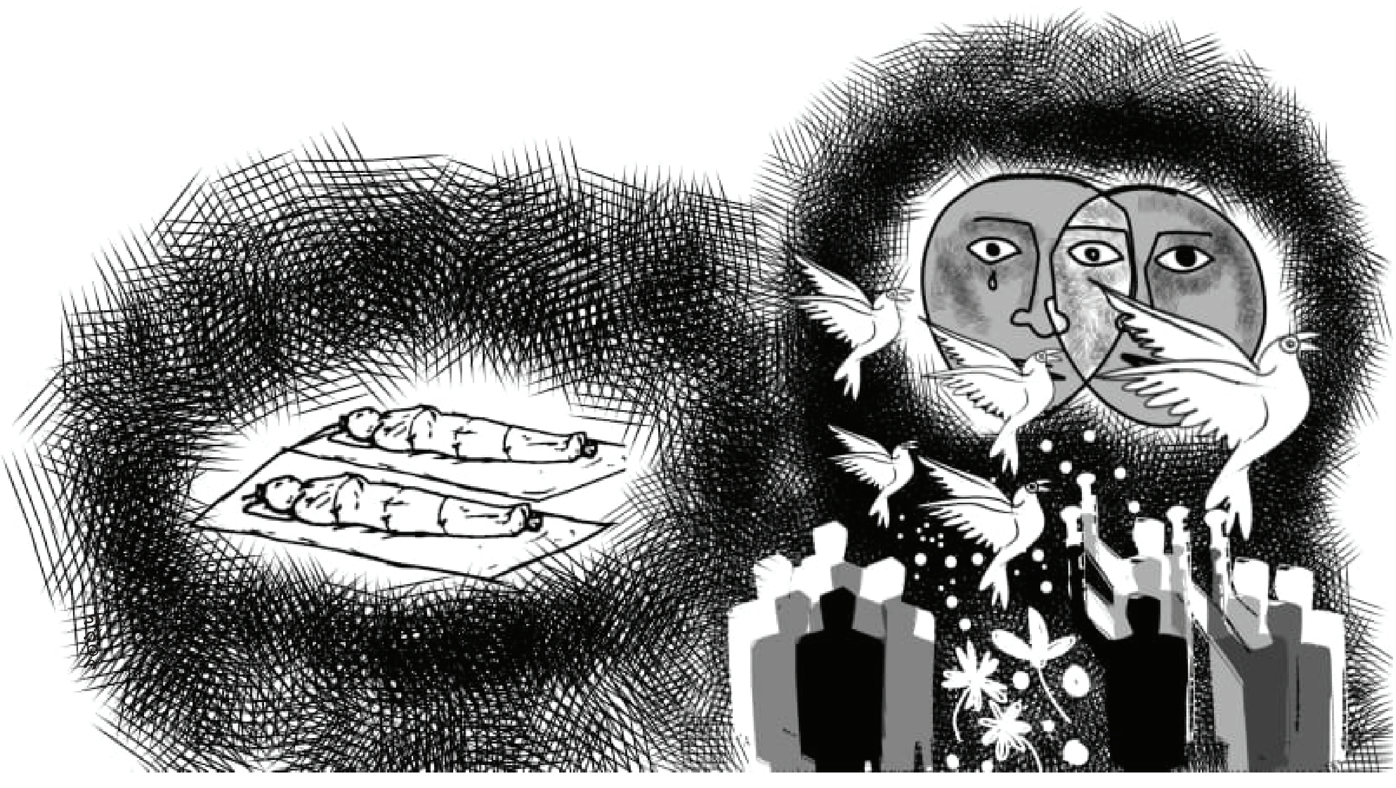

পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের পরিক্রমায় 'জুলাই ২০২৪'-এর মর্ম অনুধাবন করতে পারা।

পাঠ-পরিচিতি

হাসান রোবায়েতের 'সিঁথি' কবিতায় সাম্প্রতিক বাংলাদেশের এক নির্মম ও মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থান ২০২৪-এ বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের মানুষ নতুনভাবে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে; কিন্তু অগণিত মানুষের আত্মদানের বিনিময়ে রচিত হয়েছে সে মৃত্যুর গাথা। শাসকপক্ষের মরণ-কামড় উপেক্ষা করে প্রাণ দিয়েছে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। মুখের ভাষার উচ্চারণরীতি আর বাগবিধি ব্যবহার করে কবি এক রক্তস্নাত বাংলদেশের অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন। তাতে দেশের কল্যাণ আর মানুষের মুক্তির প্রত্যয়ও ঘোষিত হয়েছে। কবিতাটিতে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪-এর অভ্যুত্থান এক নতুন বিজয়গাথা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কবি-পরিচিতি

হাসান রোবায়েত ১৯৮৯ সালের ১৯ই আগস্ট বগুড়া জেলার সোনাতলা থানার অন্তর্গত পশ্চিম তেকানী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং মায়ের নাম ফারহানা রহমান। তিনি বগুড়ার পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সরকারি আজিজুল হক কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য কবিতার বই *মীনগন্ধের তারা*, *মাধুডাঙাতীরে*, *মুসলমানের ছেলে*, *ছায়াকারবালা* ইত্যাদি। *মেঘের ভিতর হরিণ ঘুমায়* তাঁর কিশোর কবিতার বই।

কর্মঅনুশীলন

ক. 'সিঁথি' কবিতাটিতে যেসব আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি তালিকা করো।
খ. তোমার শ্রেণিতে কবিতাটি আবৃত্তির জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করো। (শিক্ষকের সহায়তায়)
গ. শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থান—২০২৪ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গোরস্থান শব্দের অর্থ কী?

ক. জীবনাবসান খ. সমাধিক্ষেত্র
গ. দোজখ ঘ. বাঁশঝাড়

২. ‘চিরকালই স্বাধীনতা
আসে এমন রীতিতে’– **কথাটির অর্থ কী?**

ক. স্বাধীনতা অর্জন সহজ নয়
খ. স্বাধীন দেশের মানুষ হওয়া
গ. স্বাধীনতা অর্জনের পথে অনেক চড়াই-উৎরাই থাকে
ঘ. আত্মদানের মাধ্যমেই অর্জিত হয় স্বাধীনতা

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মূর্তি (২) : নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানি ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ-ওপিঠ। বোকা ডাক্তার খামোখা কেটেকুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে।

নেতা : তুমিও এই দলে এসে জুটেছ নাকি?

মূর্তি (২) : গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারব না।

৩. সংলাপটিতে সিঁথি কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে, তা হলো–

i. অন্যায়ের প্রতিবাদে আত্মদান
ii. বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
iii. ন্যায়-অন্যায়ের কোনো পার্থক্য নাই

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i , ii ও iii

৪. সংলাপের মূলভাব নিচের কোন চরণে পাওয়া যায়?

ক. একটা মানুষ মারার লাগি কয়টা গুলি লাগে ছার
খ. কওমি তরুণ দাঁড়ায়া ছিল কারবালারই ফোরাতে
গ. খোদার আরশ কাঁইপা ওঠে শুইনা বাপের হাহাকার
ঘ. সারা আকাশ ছাইয়া আছে কোন শহিদের গায়ের শাল

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রথম অংশ

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

দ্বিতীয় অংশ

সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে –
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

ক. সিঁথি কবিতার রচয়িতা কে ?

খ. 'গোরস্থানে কান্দে শহিদ –
পঙ্গু যেন হয় না দ্যাশ।' – এখানে কীসের আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে তা বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশটিতে 'সিঁথি' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশটি 'সিঁথি' কবিতার মূল বক্তব্য। মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১। রংপুরই তো বাংলাদেশ- কীভাবে? ব্যাখ্যা করো।

২। চিরকালই স্বাধীনতা কীভাবে আসে? বুঝিয়ে লেখো।

৩। খোদার আরশ কেঁপে উঠল কেন?

৪। মা অহন পোলাকে আইডি কার্ডের ফটোতে খোঁজেন কেন? বুঝিয়ে লেখো।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি : সপ্তবর্ণা (বাংলা)

অহংকার পতনের মূল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।